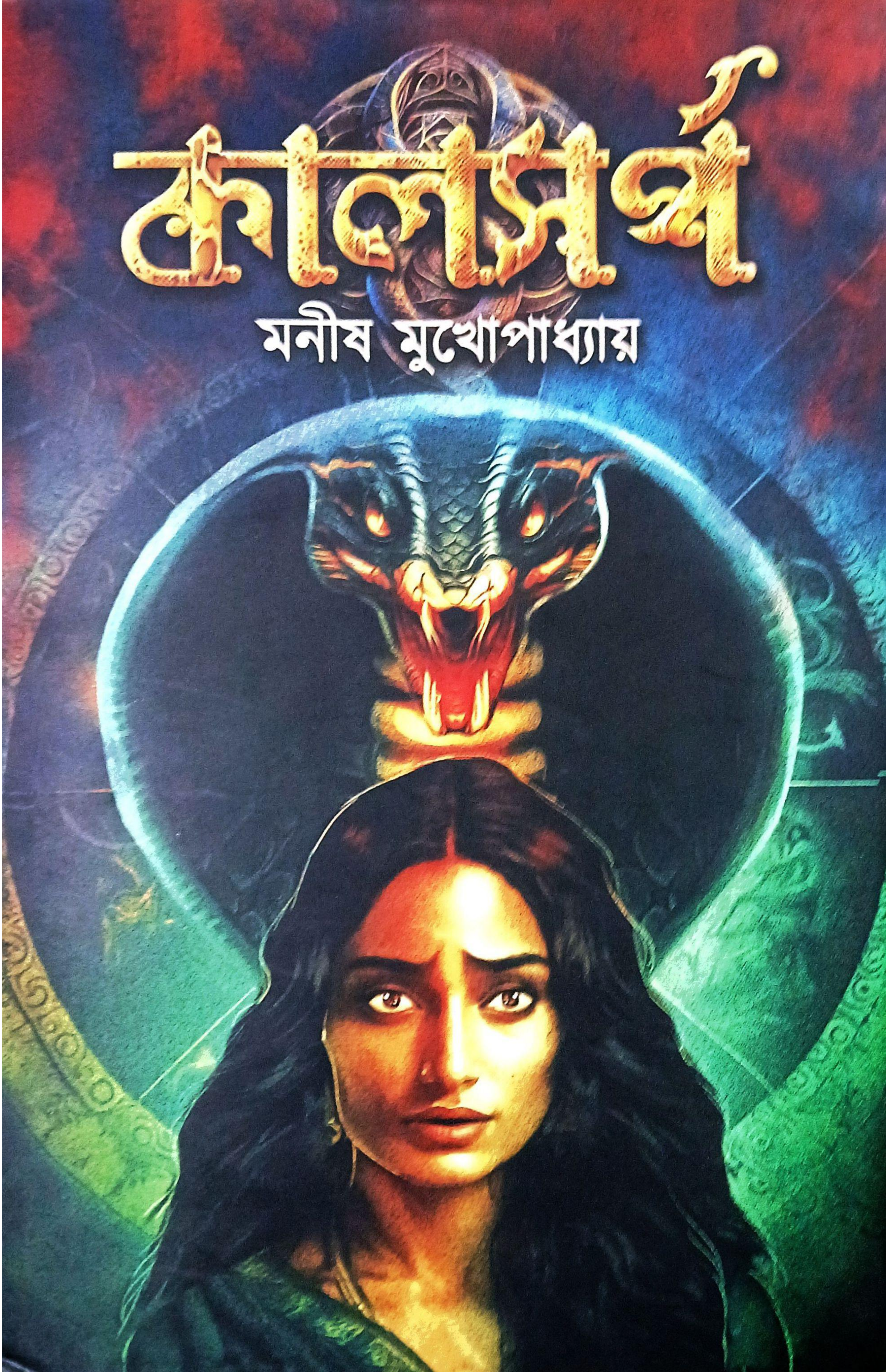

কালসর্প
মনীষ মুখোপাধ্যায়

পৃথিবী জুড়ে রয়েছে সাপ নিয়ে ভয়। এখানে যেমন মনসা তেমনই আফ্রিকায় মামি ওয়াটা! কোনোভাবে তার প্রভাব যদি এই বঙ্গভূমিতে পড়ে। যদি শেষ হয়ে যায় একটা সংসার! বা হয়ত অমাবস্যার সুযোগ নিয়ে কোনো বাপ তার মেয়েকে পিশাচের কাছে অর্পণ করে?

ISBN 978-81-958813-8-3

কালসর্প

মনীষ মুখোপাধ্যায়

কালসর্প

মনীষ মুখোপাধ্যায়

SMELL OF BOOKS

Kaal Sharpo
by **Manish Mukhopadhyay**

কালসর্প

মনীষ মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০২৪

© মনীষ মুখোপাধ্যায়

ISBN : 978-81-958813-8-3

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

অলংকরণ : অভীক দাস

বর্ণবিন্যাস : ইন্দ্রাণী নাগ

বর্ণ সংশোধন : মনীষা বসু

মুদ্রক : রা মুদ্রণ, কলকাতা ৭০০০০৬

print@raaprakashan.com

PH: + 91 8597973884

www.raaprakashan.com

স্মেল অফ বুকস-এর পক্ষে
সায়ন সরকার, সৌরভ চক্রবর্তী, রত্নদীপ চ্যাটার্জী, সুমন্ত মাঝি ও তথাগত চৌধুরী
কর্তৃক
১৪ এম এন সরণী, নদীকূল রোড, নিমতা, কলকাতা ৭০০০৪৯

Published by Saayan Sarkar, Sourav Chakraborty, Ratnadip Chatterjee, Sumanta Maji & Tathagata Chaudhuri
on behalf of Smell of Books
14 M.M. Sarani, Nadikul RD. Nimta, Kolkata 700049

মূল্য : ৩২৫ টাকা

প্রিয় অভিষেক আইচ এবং অরিজিৎ ভদ্রকে

ভূমিকা

এই বইটিতে রয়েছে একটি উপন্যাসিকা এবং একটি বড় গল্প। দুটি রচনার মূল বিষয়বস্তুই হল অলৌকিকতা। প্রথম উপন্যাসিকা "কালসর্প" আমাদের নিয়ে যায় অজানা এক জগতে। সুদূর আফ্রিকার এক দেবীকে নিয়ে তৈরি হয়েছে গল্প। সারা পৃথিবী জুড়ে যত মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে সেই সকল সভ্যতার মধ্যেই আমরা একজন সর্পরূপী দেবতা বা দেবীর উল্লেখ পাই। শুধু সভ্যই বা বলি কেন, অনেক উপজাতির মানুষেরা যারা সভ্যতার আলো এড়িয়ে চলেন, তাঁদের বিশ্বাসেও এসেছে এমন কোনো দেবী। কারণ হয়ত সাপ সম্পর্কে মানুষের সহজাত ভয়! বর্ধমানে অদূরে মেমারি নামক অঞ্চলে এক আফ্রিকান সর্পদেবী কীভাবে তাঁর প্রভাব বিস্তার করছেন। কীভাবেই সেই দেবীর গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে পরিবারটি সেই নিয়েই এই অলৌকিক কাহিনির অবতারণা। মুক্তি কি আদৌ সম্ভব?

দ্বিতীয় রচনা "অমাবস্যা''। এই কাহিনিতে ব্যক্ত করা হয়েছে মানুষের চিরাচরিত ক্ষমতার লোভের কথা। ক্ষমতার কাছে কোনো সম্পর্কই যেন আপন হয় না। এখানে বাবাও নিজের মেয়েকে, তার আত্মাকে পিশাচের কাছে বাঁধা রাখতে পারে। কিন্তু সবকিছুর শেষে থাকে ভালবাসা। সব অলৌকিক শক্তির চেয়ে বড় শক্তি হল এই ভালবাসা। ভালবাসার টানের কাছে কোনো অপশক্তিই কি কখনো টিকে থাকতে পারে?

উত্তর পেতে হলে বইটি পড়ে ফেলতে হবে।

— মনীষ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা

সূচি

কালসর্প

একটা বিশাল সাইজের কাতলা মাছ কলতলায় রাখা হয়েছে। বাড়ির বাচ্চারা হাঁ করে সেই মাছ দেখছে। যেন সেটা একটা কাতলা মাছ নয়, তিমি জাতীয় কোনো মাছ তুলে আনা হয়েছে জল থেকে। বীরেশ্বর নিয়োগী একটু দূরে দাঁড়িয়ে জেলেদের উদ্দেশ্যে নানা উপদেশ দিয়ে চলেছেন। এই মাছ নিয়ে আসার পেছনে তাঁর গরজটাই ছিল সবচেয়ে বেশি। বিয়েবাড়ির কোলাহলের মধ্যে জেলেরা বীরেশ্বরের কোনো কথা শুনতে পাচ্ছে না। নবীন, যে কি না জেলেদের প্রধান, সে গলাটা চড়িয়েই জিজ্ঞেস করল, “বাবা, মাছের পিস কেমন হবে যদি আরেকবার বলে দিতেন!”

বীরেশ্বর রেগে গেলেন। রেগে গেলে তিনি বাপের কুপুত্র। তিনি গর্জন করে বললেন, “আরে হতভাগা, কতবার করে বলছি ওই বড় মাছটাকে বরের বাড়ি পাঠাতে হবে গায়ে হলুদের জিনিসের সাথে আর মাঝারিটা কাটবি দুপুরের খাওয়ার জন্য। একটা এইটুকু কথা, ওদিকে তোরা বুঝতেই চাস না। কী করে যে তোরা ব্যবসা করে খাস কে জানে!”

পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে বুঝতে পেরে অলোক সামন্ত এগিয়ে এলেন। তিনি হলেন কনের মামা। এমনিতে তাঁর বাউন্ডুলে স্বভাবের জন্য প্রচুর বদনাম আছে। কিন্তু এবার যেন এই ক’মাস ভাগ্নির বিয়ের জন্য

একটু ঘরমুখো হয়েছেন। মাস কয়েক আগেই তিনি ফিরেছেন ব্রহ্মদেশ থেকে। আবার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, যাননি। আদরের ভাগ্নি তাঁর হাত ধরে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছে, মামা আমার বিয়েতে তুমি না থাকলে কিন্তু আমি বিয়েই করব না। এই আবদার তিনি ফেলতে পারেননি। বীরেশ্বর হলেন কনের কাকা। একমাত্র কাকা। আলুর ব্যবসা করে ভদ্রলোক কোটিপতি হয়েছেন। অলোক তাঁর জামাইবাবুর এই ভাইটিকে বেশ ভালো করেই চেনেন। হঠাৎ করে টাকা পয়সা করে ফেলায় বীরেশ্বর যে অসম্ভব অহংকারী হয়ে পড়েছেন এটা বুঝতে কারোই অসুবিধা হয় না। বিশেষ করে দেবেশ নিয়োগী যখন ভাইকে মাছের ভারটা দিয়েছিলেন তিনিও জানতেন এ নিয়ে তাঁর ভাই অনেক হাতি-ঘোড়া মারবেন, করবেন প্রচুর জলঘোলা।

বীরেশ্বর জেলেদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে সেরা মাছের ব্যবস্থা করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই ঘটনা শুনিয়েওছেন জনে জনে। আর এখন এই বিয়ের দিন সকালে তিনি লেগেছেন জেলেদের পেছনে। অলোক বীরেশ্বরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতটায় হালকা চাপ দিয়ে বললেন, "ও বীরুদা আসুন ওদিকটায় যাই। ওদের নিজেদের মতো ছেড়ে দিন না। চলুন বার্মা থেকে কয়েকটা চুরুট এনেছিলাম সেগুলোর গতি করা যাক।"

হঠাৎ বড়লোক যারা হয়ে ওঠেন তাঁদের এইসব জিনিসের প্রতি একটা ক্ষীণ আসক্তি জন্মায়। চুরুটের প্রলোভন বীরেশ্বরকেও সামান্য টলিয়ে দিল। তিনি গলার স্বর মিহি করে বললেন, "আরে অলোক, তুমি জানো না। এই ব্যাটারা হল গিয়ে দুনিয়ার ফাঁকিবাজ। গুনে গুনে টাকা নিয়ে নিয়েছে মাছের, ওদিকে দেখবে একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে থাকবে। দেখা যাবে বরের বাড়ি গিয়ে পৌঁছবে ছোট মাছটা আর আমরা ওই তিমি সাইজের মাছটা গাণ্ডেপিণ্ডে গিলব। তেমন যদি হয়, ভাবো তো একবার এতে আমাদের মান থাকবে! দাদাবাবুর মাথা হেঁট হবে না?"

খুব একটা যে ভুল কিছু বলেছেন বীরেশ্বর তেমন কিন্তু নয়। সত্যিই পাত্রপক্ষ ছোট মাছ পেয়ে যদি নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে তাহলে বংশের মান থাকে না। নিয়োগীদের বংশের এ তল্লাটে একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। সেই ঐতিহ্য কখনোই ক্ষুণ্ণ হোক তা কেউই চায় না। অলোক নবীনকে এবার জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি বুঝে নিয়েছ তো কীভাবে কী করতে হবে?"

বিনা কারণে বকা খেয়ে নবীনের মেজাজও কিছুটা বিগড়ে ছিল। সে বলল,

“বড় মাছটা যে গায়ে হলুদের তত্ত্বে যাবে এ কি আর আমরা জানি না! সেই কবে থেকে একই কথা বলে বলে বীরুবাবু মাথা খারাপ করে দিচ্ছেন। আমি দুপুরের খাওয়ার মাছের পিস কেমন কাটব সেটাই জিজ্ঞেস করছিলাম। উনি আবার হম্বিতম্বি শুরু করে দিলেন।”

নবীনের কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন বীরেশ্বর, “কী বললি হম্বিতম্বি! যা, যা, দূর হ ছোটলোকের জাত। তোদের মাছ আমি আর নেব না।”

“জাত তুলে কথা বললে কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে বীরেশ্বরবাবু!” নবীনের গলাতেও শুকনো লঙ্কার ঝাঁঝ টের পাওয়া গেল। এ বুনো ওল তো ও বাঘা তেঁতুল। পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যায় এমন হল অবস্থা। অলোক বীরেশ্বরের পাঞ্জাবির হাতা ধরে টান দিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি এত তাড়াতাড়ি ঝগড়ায় ইতি টানতে মোটেই রাজি নন। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, “তোদের ব্যবসার অবস্থা তো শেষ, তা কি কারও জানা নেই ভেবেছিস! দয়া করে একটা কাজ দিয়েছি তায় আবার মুখে মুখে চোপা! তোরা হলি কুত্তারও অধম। মাছের বাজারে ঘোরা মরা কুকুর সবগুলো।”

আর সহ্য করতে পারল না জেলেদের সর্দার নবীন। বড় মাছটা কাঁধে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। চোখের ইশারায় অন্য মাছটাও তুলে নিতে বলল এক সঙ্গীকে। সেও সর্দারের কথা মতো মাছটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর নবীন বলল, “অন্য কারও থেকে মাছ নিন, আপনাদের আমরা মাছ বেচব না।”

“কী! এত বড় কথা? আমার বাপের আমল থাকলে চাবুক দিয়ে চাবকে সবকটার পিঠের চামড়া খসিয়ে দিতাম।” বীরেশ্বর নিয়োগী আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন।

হঠাৎ নবীনের পিঠ থেকে ধপ্ করে শব্দ করে মাছটা পড়ে গেল মাটিতে। তার সামনে একজন এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর চেহারা কঙ্কালসার! পচা গন্ধে পরিবেশ ভরে উঠল নিমেষের মধ্যে। যিনি এসে দাঁড়িয়েছেন, তিনি জড়ানো গলায় কিছু একটা বললেন। যে কথা বোঝার সাধ্য কারও নেই।

বীরেশ্বরও কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি যেন ভূত দেখছেন! এই ঘটনা ঘটার কথা নয়। এ অসম্ভব! যে মানুষটা দীর্ঘ সাত বছর ধরে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেননি, যে মানুষটার পিঠে বড় বড় ঘা হয়ে গেছে একভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে, এতদিন যাঁর শরীরে কোনো সাড় ছিল না,

তিনি কীভাবে উঠোন পার করে এখানে এসে দাঁড়ালেন! ডাক্তার তো বলেই দিয়েছিলেন, ত্রিলোকেশ্বর নিয়োগী আসলে মারাই গেছেন, শুধু হৃদযন্ত্রটা চলছে বলেই শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে যায়নি। মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা কেবল। অথচ সেই লোক হেঁটে এতখানি চলে এল!

বীরেশ্বর কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন, "কিছু বলছেন কাকাবাবু?"

কঙ্কালসার ত্রিলোকেশ্বরের মুখ থেকে আবার সেই দুর্বোধ্য গোঁ গোঁ শব্দটা শোনা গেল। অলোক কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলেন। বোঝার চেষ্টা করলেন প্রায় একশো বছর বয়সি মানুষটার বোবা ভাষা। হ্যাঁ এবার যেন কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। চোখ বড় বড় হয়ে গেল অলোকের। তাঁর হাত পা ঠান্ডা হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে। মনে হল মাটি সরে যাবে পায়ের তলা থেকে। তিনি শুনতে পেয়েছেন ত্রিলোকেশ্বরের বোবা ভাষার মধ্যে লুকিয়ে থাকা আসল কথা। ত্রিলোকেশ্বর বলছেন, "এ বিয়ে হবে না। কালসাপের ছোবল থেকে দেবুর মেয়েটাও বাঁচবে না। আমি তাকে দেখেছি এ বাড়িতে ঘোরাফেরা করতে। সে এসে পড়েছে... সে এসে পড়েছে..."

কথাটা কয়েকবার বলার পরেই আবার মাটিতে ধপ্ করে পড়ে গেলেন ত্রিলোকেশ্বর নিয়োগী। আবার সেই সাড়হীন দেহটা মাটিতে পড়ে রইল। ভেতর বাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল এ বাড়ির পুরোনো চাকর ভোলা। সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "ছোটকর্তাকে পালঙ্কের ওপর থাকতে না দেখে ভয়ে আমার কলজে শুকিয়ে গেছিল গো! সারা বাড়ি খুঁজে শেষে এখানে এসে দেখি... কিন্তু কর্তা এখানে এলেন কী করে?"

বীরেশ্বর হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন ভোলার দিকে। তিনি নিজেও বুঝতে পারলেন না কী উত্তর দেবেন। জেলেরাও মুখ চাওয়াচাওয়ি করল কিছুক্ষণ। ওরা জানে সেদিনের কথা। যেদিন তিরানব্বই বছরের শক্তপোক্ত ছোট জমিদার কর্তা নিজের বাগানে মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন সেদিন ওরাও এসেছিল দেখতে। ছোট জমিদার কর্তার চোখে ছিল ভয়। কিন্তু কীসে ভয় পেয়েছিলেন তিনি!

২

দুর্গাপুর এক্সপ্রেস নিলেই তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে ভেবেই বরের গাড়ির ড্রাইভার

ডানকুনি টোল পার করে গাড়িটার গতি বাড়িয়ে দিল। পথে বেশ কিছুটা যেতে হবে। রাতের লগ্ন বলে বাঁচোয়া। পেছনে বরযাত্রীর বাস আসছে। বরের কাকা একবার হাতঘড়িটা দেখলেন। পাঁচটা কুড়ি! তিনি উসখুস করে ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলেন, "কতক্ষণ লাগবে দাদা?"

"যে স্পিডে যাচ্ছি একঘণ্টা ধরুন না।" রাস্তার দিকে চোখ রেখে উত্তর দিল ড্রাইভার।

"হাতে তো অঢেল সময়, এত তাড়াহুড়ো করে চালানোর কোনো দরকার নেই। আপনি আস্তেই চালান।" বরের কাকা কিছুটা নির্দেশের ভঙ্গিতেই কথাটা বললেন।

ড্রাইভার হাসল। বলল, "বিয়ের ব্যাপার তায় আবার শীতের বেলা। ঝপ করে রাত নেমে আসবে। দেখছেন না এখনই কত অন্ধকার। বেলায় বেলায় পৌঁছে গেলে একটু বিশ্রাম নিতে পারা যাবে।"

মেমারির নিয়োগী বাড়িতে ছেলের বিয়ে ঠিক করে ছেলের বাড়ির লোকেদেরও একটা অন্যরকম ভাব এসেছে। বরের বাবা বড় কষ্ট করে বড় হয়েছেন। জমিদারদের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তিনিও একটু বুক চওড়া করে ফেলেছেন বইকি।

সিঙ্গুরের কাছাকাছি গাড়িটা ঢুকতেই বরযাত্রীর বাসটা বেশ পিছিয়ে গেল। ড্রাইভার আরও একটু গতি বাড়িয়ে দিল গাড়িটার। বড় গাড়ি পেয়ে সেও যেন হাত খুলে চালাচ্ছে। একটা বেসরকারি বাসকে নিমেষের মধ্যে কাটিয়ে এগিয়ে গেল বরের গাড়িটা। কোত্থেকে কিছু নেই একটা বাচ্চা ছেলে তখনই দৌড়ে হাইওয়েটা পার হতে চাইল। আশেপাশের কোনো গ্রামেই হয়তো থাকে ছেলেটা। বরের কাকা চিৎকার করে উঠলেন, "হেই সাবধান! ব্রেক...ব্রেক..."

কিন্তু ততক্ষণে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। প্রবল গতিতে চলতে চলতে হঠাৎ ব্রেক কষার ফলে গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। পথের ডানদিকে চলতে থাকা গাড়িটা চলে এল পথের একেবারে বাঁদিকে। পেছনে আসা বেসরকারি বাসটাও হঠাৎ ব্রেক কষতে চাইল কিন্তু পারল না। সজোরে বাসটা ধাক্কা মারল গাড়িটাকে। যেকোনো কারণেই হোক সামনের বাঁদিকের দরজাটা খুলে গেল। বরের কাকা ছিটকে পড়লেন পথের বাঁদিকের নরম জমিতে। হঠাৎ গাড়িটা বাঁদিক থেকে সরে এসে রাস্তার মাঝখানে একটা চক্কর কাটল তারপরেই সজোরে ধাক্কা

মারল ডানদিকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রলারের গায়ে। আর রক্ষা করা গেল না। একটা খেলনা গাড়ির মতো দুমড়ে মুচড়ে গেল সেটা নিমেষের মধ্যে।

সন্ধে সাতটা নাগাদ নিয়োগী বাড়িতে খবরটা পৌঁছল। বরের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। সিঙ্গুরের কাছে একটা ভয়ংকর অ্যাক্সিডেন্টে দুমড়ে গেছে গাড়িটা। বর এবং তার এক দিদি সহ ড্রাইভার ঘটনাস্থলেই মারা গেছে। সেই গাড়িতে থাকা বরের কাকা একমাত্র বেঁচে গেছেন, কিন্তু তাঁর অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

মুহূর্তের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল নিয়োগী বাড়িতে। বিয়ে বাড়ির মনোরম পরিবেশে নেমে এল শ্রাদ্ধবাড়ির কঠিন শোকের ছায়া। দেবেশ নিয়োগী মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। মাঝে মাঝেই বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। কিন্তু অদ্ভুত একটা জিনিস লক্ষ করা যাচ্ছে রূপার মধ্যে। তার বিয়ে ভেঙে গেছে। তার বর বিয়ে করতে আসার সময় দুর্ঘটনায় মারা গেছে। অথচ তার মধ্যে কোনো শোকসন্তাপ নেই। অনেকে ভাবছে সে হয়তো কিছুটা পাগল পাগল আচরণ করছে ঘটনার আকস্মিকতায়।

বিয়েবাড়ির সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক অতিথি ফিরে গেছে। অনেকে থেকে গেছে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। রূপার বড়মামার ছেলে উল্লাস হঠাৎ কথাটা পাড়ল। সে তার পিসি, অর্থাৎ রূপার মায়ের হাতটা চেপে বলল, "পিসি তুমি যদি কিছু মনে না করো তো একটা কথা বলি, রূপুর বিয়ে আজই হবে।"

রূপার মা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তাঁর বড়দাদার ছেলেটির দিকে। তাঁর চোখ থেকে তখনও জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। আবার সেই চোখেই একই সঙ্গে খেলা করছে তীব্র ভর্ৎসনা আর বিস্ময়। অতি কষ্টে তিনি বললেন, "বলিস কী?"

"হ্যাঁ পিসি, যা শুনলে ঠিকই শুনেছ। বর্ধমানে আমার এক বন্ধু থাকে, তার এখনও বিয়ে হয়নি। ওর মা হন্যে হয়ে মেয়ে খুঁজছেন ছেলেকে সংসারী করার জন্য। ছেলে পেশায় ডাক্তার। আর কিছু দিনের মধ্যেই কলকাতায় একটা নামকরা বেসরকারী হাসপাতালের একটা বিভাগে সে কাজের দায়িত্ব নিতে চলেছে। বলো রাজি আছ কিনা! আমি একবার তাকে ডাকলেই সে আসবে এবং রূপুকে বিয়ে করতে রাজি হবে। এর কারণ এক্ষুনি আমি বলতে পারব না।"

"কিন্তু অতিথিরা যে ফিরে গেল!" রূপার মা চোখ মুছতে মুছতে বললেন।

উল্লাস হেসে বলল, "পিসি, তোমার মেয়ে অতিথিদের সাথে ঘর করবে না, সে ঘর করবে তার বরের সাথে। আমার এই প্রস্তাব পিসেমশাইকে জানাও। তিনি কী বলেন দ্যাখো।"

রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ মোটরসাইকেলে চড়ে বর বিয়ে করতে এল। অতি সাধারণ একটা পাঞ্জাবি পরেছে সে। উল্লাস তার বন্ধুর জন্য একসেট ধুতিপাঞ্জাবি নিয়ে এল। সেটা পরেই বিয়েতে বসল সে। দেবেশ নিয়োগী এবং তার পরিবারের সকলেরই জামাইকে বেশ পছন্দ হয়েছে। একটা ডিউটি পালন করার মতোই ঝপ করে বিয়ে করে ফেলল ছেলেটা তার ছেলেবেলার বন্ধুর কথায়। ঠিক যেন সত্যজিত রায়ের ছবির দৃশ্য।

৩

দক্ষিণ কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া গেছে আপাতত। ফ্ল্যাটটা পাঁচতলার ওপর। হাসপাতাল থেকেই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ডাক্তার গৌরব সেনের অপারেশনের হাত খুব ভালো। সেই সুবাদেই এই চাকরিটা পাওয়া। এখন বেশ রাত হয়েছে। গৌরব একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। পাঁচতলার ফ্ল্যাট হওয়ার কারণে বেশ হাওয়া বাতাস খেলে। বারান্দায় ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে।

রূপা গৌরবকে ডাকল, "আপনি শুতে আসবেন না?"

গৌরব পেছন ফিরে তাকাল। মেয়েটা এখনও তাকে আপনি আজ্ঞে করছে। সে অবশ্য তুমিই বলেছে প্রথম থেকে। মেয়েটা তার বিয়ে করা বউ হওয়া সত্ত্বেও কেন যে সংকোচ কাটছে না কে জানে!

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে গৌরব বলল, "তুমি শুয়ে পড়ো, কাল একটা অপারেশন আছে। সিগারেটটা শেষ করে রুগীর রিপোর্টগুলোর ওপর একবার চোখ বোলাতে হবে।"

"আপনি না এলে শোব না। আমার ভয় করছে। মনে হচ্ছে পাখা দিয়ে কেউ ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে!" বলল রূপা।

ভ্রু কুঁচকে গেল গৌরবের। এসব আবার কী অদ্ভুত কথা। আজ দু'দিন হল সে এই ফ্ল্যাটে আছে। তার তো কখনোই পাখার দিকে তাকিয়ে এসব মনে হয়নি। মেয়েটা পাগল নাকি! উল্লাস তো তেমন কিছু বলেনি তাকে। নিজের পিসতুতো

বোন হলেও যদি মেয়েটা পাগল হত তাহলে হয়তো উল্লাস তার সাথে এই মেয়ের বিয়ে কখনোই দিত না। উল্লাস না থাকলে সে হয়তো ভেসেই যেত একদিন। বিশেষ করে ফিজ জমা দেওয়ার ব্যাপারটা সে কখনোই ভুলবে না। এমন বন্ধুর জন্য তার পাগল বোনকেও বিয়ে করা যায়।

গৌরব বাধ্য হয়ে রূপার সাথে শোয়ার ঘরে ঢুকল। পাখার দিকে চাইল সে। ফুলস্পিডে ঘুরছে পাখাটা। কলকাতায় তেমন শীত পড়েনি তবুও এত জোরে পাখা চলার কারণটাও মাথায় ঢুকল না গৌরবের। হাওয়ার গতি বেশি থাকার কারণে মাঝে মাঝে ব্লেডগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সে বলল, "কই কেউ তো নেই!"

লজ্জা পেয়ে মাথাটা নামিয়ে নিল রূপা। তাকে এখন দেখাচ্ছে কিশোরী মেয়েদের মতো। মাথা নিচু করেই ক্ষীণ স্বরে সে বলল, "আপনি আছেন তো, তাই সে দেখা দিচ্ছে না। আমি একা থাকতে পারছি না। গা ছমছম করছে।"

গৌরব হাসল। এমন হতেই পারে। একা একা মেয়েটার ভয় করছে। তাছাড়া মেয়েটার বয়সই বা কত। উল্লাস বলেছিল তেইশ বছর। মেয়েটার মাথা পড়াশোনায় ভালো ছিল না। কোনোমতে বিএ পাশ করার পরে আর পড়েনি। দেখতে সুন্দর, তাই প্রথমবার সম্বন্ধ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়ে গেছিল। সেই বিয়েটাই হয়নি। আর সেদিনই গৌরব একে বিয়ে করেছে।

গৌরব বলল, "আচ্ছা তুমি ঘুমানোর চেষ্টা করো, আমি এই ঘরেই বসে আমার কাজ করি।"

রূপা মাথা নাড়ল। তার পর চুপ করে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। গৌরব মেয়েটার সারল্য দেখে খুব আনন্দ পেল। তারপর চোখ বোলাতে লাগল রুগীর রিপোর্টগুলোয়। একজন সত্তরোর্ধ্ব মহিলার গলব্লাডার অপারেশন আছে। হিমোগ্লোবিন বেশ কম মহিলার শরীরে। ডাক্তার বিনয় কবিরাজ ওর কাছে রেফার করেছে কেসটা। মহিলার ব্লাড-সুগারও বেশ বাড়াবাড়ি রকমের বেশি। বেশ কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থেকে যাচ্ছে। কিন্তু অপারেশন না করলেও চলবে না। মহিলা পেটের ব্যথায় ছটফট করছেন। স্টোনগুলোর দৈর্ঘ্যও বেশ ভালোই। রিপোর্টগুলো দেখতে দেখতে হাই উঠল গৌরবের। কাগজগুলো ফাইল বন্দি করে সে আলো নিভিয়ে খাটে শুয়ে পড়ল। আর তখনই একবার পাখার দিকে চোখ গেল ওর, এবার একটু শীত করছে। পাখাটা কমাতে যেতেই

মনে হল, সত্যিই যেন কেউ ঝুলছে পাখা থেকে। চোখটা কচলে ভালো করে চাইল গৌরব। নাহ্ কিচ্ছু নেই। মতিভ্রম হয়েছে।

৪

"তুমি তো সাপের প্যাঁচে পড়েছ ডাক্তার! আমার জীবন তুমি বাঁচাতে পারবে না। বরং নিজের জীবন বাঁচানোর কথা ভাবো।"

ভ্রু কুঁচকে বৃদ্ধার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল গৌরব। বৃদ্ধার প্রেশার বারবার ফল করে যাচ্ছে। আজ অপারেশন হওয়ার কথা। অথচ অপারেশন করা যাবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে! আর একবার প্রেশারটা দেখল গৌরব। এবার মনে হচ্ছে অনেকটা বেড়ে গেছে, এটাও অস্বাভাবিক।

গৌরব উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। বৃদ্ধা ওর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটা ব্যঙ্গের হাসি হাসছেন। নার্সকে ডেকে গৌরব বলল, "ওঁর সোডিয়াম পটাশিয়ামটা একবার চেক করুন, আর ওঁর বাড়ির লোকেদের একবার আমার চেম্বারে পাঠিয়ে দিন। আজ মনে হচ্ছে অপারেশন করা যাবে না। সব ঠিকঠাক থাকলে কাল দেখা যাবে।"

"কিন্তু স্যার মহিলার কন্ডিশন মোটেই ভালো না। আয়া বলছিল কাল উনি সারারাত ব্যথায় ছটফট করেছেন। তাছাড়া..."

"তাছাড়া কী মিসেস চক্রবর্তী?" গৌরব নার্সের দিকে চাইল।

নার্স বললেন, "হিমোগ্লোবিন লেভেল কম, হাই সুগার, আজ প্রেশার ফ্ল্যাকচুয়েট করছে। অপারেশন টেবিলে কিছু একটা হয়ে গেলে পেশেন্ট পার্টি ঝামেলা করতে পারে। আবার ব্যথা সহ্য করতে না পেরে যদি আজ রাতেই উনি মারা যান তাহলেও সমস্যা হতে পারে। ওঁর ছেলেকে মোটে বিশ্বাস করা যায় না, এই অঞ্চলের বড় গুন্ডা!"

এবার বুঝতে পারল গৌরব। সত্যিই বোধহয় ও সাপের প্যাঁচে পড়েছে। সেটারই ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন হয়তো বৃদ্ধা। ও বলল, "আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। ওঁর ছেলে যদি বাইরে থাকেন তাহলে আমার সাথে একবার দেখা করতে বলুন।"

আর অপেক্ষা না করে গৌরব নিজের চেম্বারের দিকে চলে গেল। এই

হাসপাতালটায় ওর একটা নিজস্ব চেম্বার আছে। ছিমছাম এবং সুন্দর করে সাজানো একটা চেম্বার, যেটার স্বপ্ন ও বারবার দেখে এসেছে। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আরাম করে বসল গৌরব। প্রায় সাথে সাথেই দরজায় টোকা পড়ল।

"ভেতরে আসুন!"

গৌরবের অনুমতি পেয়ে যে লোকটা ঘরের ভেতর ঢুকল তাকে নেহাতই সাদামাটা ধরনের দেখতে। রোগাটে চেহারা। চেহারার মধ্যে কেমন যেন খেতে না পাওয়া একটা ভাব আছে। লোকটা নমস্কার জানিয়ে বলল, "আমি নয়ন দাসের ছেলে। আমার নাম মাধব!"

"মাধব দাস!" এই নামটা কোথাও যেন শুনেছে গৌরব। মনে করার চেষ্টা করল বেশ কয়েকবার কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ল না। মাধবকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল গৌরব। মাধব নামের লোকটা বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মাথা নিচু করে বলল, "আমার মায়ের যন্ত্রণাটা কমিয়ে দিন ডাক্তারবাবু। আমি জানি ও বুড়ি মরবে না এত সহজে। শাপ লেগেছে, সে শাপ নিয়ে বুড়ি বেঁচে থাকবে বছরের পর বছর। কিন্তু ছেলে হয়ে মাকে অমন যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখতে পারছি না ডাক্তারবাবু! লোকে বলে আমার মনটা পাথর দিয়ে তৈরি। হাসতে হাসতে মানুষ খুন করে ফেলি। অথচ দেখুন মায়ের এই অবস্থায় কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়েছি। আপনি আজই অপারেশনটা করে দিন।"

হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে! তার মানে এর কথাই নার্স বলছিলেন। লোকটাকে দেখে বোঝার উপায় নেই লোকটা অত বড় গুন্ডা! খুনি মানুষের সামনে গৌরব এর আগে কখনো বসেনি, একটু যেন ভয় করল ওর। চাপা গলায় বলল, "আপনার মায়ের প্রেশার ওঠানামা করছে। সুগারটাও সমস্যা করতে পারে। কাল প্রেশার নর্মাল হলে তবে অপারেশন করার রিস্ক নেওয়া যাবে।"

এবার যেন একটু ঝাঁঝের স্বরেই মাধব বলল, "আজই করে দিন। মায়ের কষ্ট হচ্ছে।"

"যদি কিছু হয়ে যায় তখন কি আপনারা আমাদের ছেড়ে কথা বলবেন?" গৌরবের আত্মবিশ্বাস কিছুটা হলেও ফিরে এসেছে।

হাসল মাধব দাস। বলল, "ভয় পাবেন না ডাক্তারবাবু। কেউ কিচ্ছু বলবে না আপনাকে। আর আমি জানি, মায়ের কিচ্ছু হবে না। আমার মা একবার পুকুরে

ডুবে গেছিল একরাত খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরেরদিন পুকুর থেকে তোলার পরেও তার শরীরে জান ছিল। ওর এত সহজে মৃত্যু নেই।"

"সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা ফর্মে সই করতে হবে।" গৌরব মাধবের দিকে তাকিয়ে বলল কথাটা।

"কীসের ফর্ম?"

মাধবের এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে গৌরব আগেই জানত। ও বলল, "ফর্মটায় লেখা থাকবে যে, অপারেশনের সময়ে আপনার মায়ের কিছু হয়ে গেলে হাসপাতাল বা আমরা কেউই দায়ী থাকব না।"

"ওহ, এই ব্যাপার!"

মাধবের মুখ দেখে মনে হল এমনই কিছু আশা করেছিল সে। মাধব বেশ বিনয়ের সঙ্গে বলল, "দিন ফর্মটা সই করে দিচ্ছি।"

ফর্মটা টেবিলের ওপরেই রাখা ছিল, সেটা গৌরব এগিয়ে দিল মাধব দাসের দিকে। মাধব দাস সেটা না পড়েই সই করে দিল খসখস্ করে।

আর অপেক্ষা করা যায় না। গৌরব বলল, "আর আধঘণ্টার মধ্যেই আপনার মায়ের অপারেশন শুরু করে দেওয়া হবে। আপনি আপাতত বাইরে অপেক্ষা করুন, প্রয়োজন হলে ডেকে নেওয়া হবে।"

হাসপাতালের প্রধান ডাক্তারের কাছে অবিলম্বে পৌঁছে গেল রোগীর রিপোর্ট আর চিঠিটা। তিনিও সবুজ সংকেত দেওয়ার পরে অপারেশন টেবিলে ঢোকানো হল বৃদ্ধাকে। জীবনে প্রথম কোনো অপারেশন করতে যাওয়ার আগে একটু যেন বেশিই নার্ভাস লাগল গৌরবের।

অ্যানাস্থেসিয়া চালু করা হল। সেখানে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। দেখা গেল বুড়ি কিছুতেই অজ্ঞান হচ্ছে না। অ্যানাস্থেসিস্ট কিছুটা অবাক হলেন, একটা কড়া ইঞ্জেকশন দিলেন বুড়িকে। তাও দেখা গেল তার চোখ খোলা। আর দেরি করা যাবে না। এরচেয়ে বেশি ডোজ দেওয়া হলে ভালোমন্দ কিছু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে! তাই গৌরব সিদ্ধান্ত নিল ও অপারেশন করবে।

বুড়ির চোখ খোলা অথচ তার মুখে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না পেট কাটার সময়ে। বুড়ি এবার ঘোরের মধ্যে কীসব যেন বলতে আরম্ভ করেছে। হাত কাঁপতে লাগল গৌরবের। বুড়ি বলে যাচ্ছে, "আই... আই... সে বড় অন্ধকার থেকে উঠে আসে, মাথাটা মানুষের দেহটা সাপের... দেহটা সাপের... সোনার

বরণ সে... আই... আই... মায়া সবই মায়া...”

হঠাৎ পাশ থেকে অ্যানাস্থেসিস্ট ডাক্তারটি বলে উঠলেন, “স্যার, ওঁর হার্টবিট চলছে না... স্যার... স্যা...”

ঘামতে লাগল গৌরব। ওর চোখ ততক্ষণে চলে গেছে মনিটরের দিকে। সত্যিই মনিটরের ইঙ্গিত স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো। অথচ বুড়ি কথা বলে যাচ্ছে! এ অসম্ভব! পাথরগুলো নির্মূল করে দেওয়া গেছে। গৌরব দ্রুত হাতে ক্ষতস্থান জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বুড়ি হাতটা চেপে ধরল গৌরবের। বলল, “তুই সাপের প্যাঁচে পড়েছিস, পালা বাছা পালা!”

৫

বিকেলের আলো মরে এসেছে। পশ্চিমদিকের আকাশের ক্যানভাসে এখন কেবল একটা হালকা গোলাপি রঙের প্রলেপ যেন কোনো শিল্পী আপন খেয়ালে বুলিয়ে দিয়ে ভুলে গেছেন সেটা মুছতে। কুয়াশা ছাদে স্কিপিং করছিল। রাত শেষ হতে না হতেই কাল তার সাঁতারের কম্পিটিশন আছে। সবে শীত পড়েছে, এখনো সাঁতার বন্ধ হয়নি। এটাই এই মরশুমের শেষ কম্পিটিশন। এই কম্পিটিশনটা কুয়াশাকে জিততেই হবে! পাঁচতলার ওপরে ছাদটা বেশ নিরিবিলি, ছাদে কেউ একটা ওঠে না। তিনতলাতে রায়চৌধুরী থাকেন, ওঁর কিছু গাছ আছে ছাদে, তবে তিনি ভোরবেলা উঠেই গাছে জল দিয়ে নেমে যান। তাই বিকেল থেকে ছাদটা কুয়াশার দখলে চলে আসে। ক্লাস সেভেনে পড়ে মেয়েটা! তবে পড়াশোনায় ওর খুব একটা মন নেই। ওর ধ্যানজ্ঞান হল সাঁতার।

দড়িটা মাথার ওপর দিয়ে যতবার ঘুরছে কুয়াশা মনে মনে গুনছে কতবার লাফানো হল। হঠাৎ করেই ওর গোনায় ভুল হয়ে গেল। একটা শব্দ এসে ওর কানে ধাক্কা মারল। স্... সস্... সস্...

ছাদের চারিদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল কুয়াশা। ওর দড়ি ততক্ষণে থেমে গেছে। ফ্রকের হাতায় কপালের ঘামটা মুছে ফেলল ও। শব্দটা থেমে গেল। আবার স্কিপিংয়ে মন দিল কুয়াশা। থেমে থাকলে চলবে না। আরও কম করে আশিটা করতে হবে। মোটে একশো বার হয়েছে। দম আনতেই হবে। সুপ্রিম মারিয়া স্কুলের রাইকে এবার কিছুতেই ফার্স্ট হতে দেওয়া যাবে না। গতবছর দমের

কারণে মাত্র সাড়ে তিন সেকেন্ডের ব্যবধানে হেরে গেছিল কুয়াশা। ইন্টারস্কুল কম্পিটিশনে সেকেন্ডকে কেউ মনে রাখে না! সাঁতারের ট্রেনার কৌশিকদা বলেন, "জানবি কুয়াশা, এই পৃথিবীতে সেকেন্ড পোস্ট হোল্ডারদের কেউ মনে রাখে না কখনো। তোকে এক নম্বরে আসতেই হবে!"

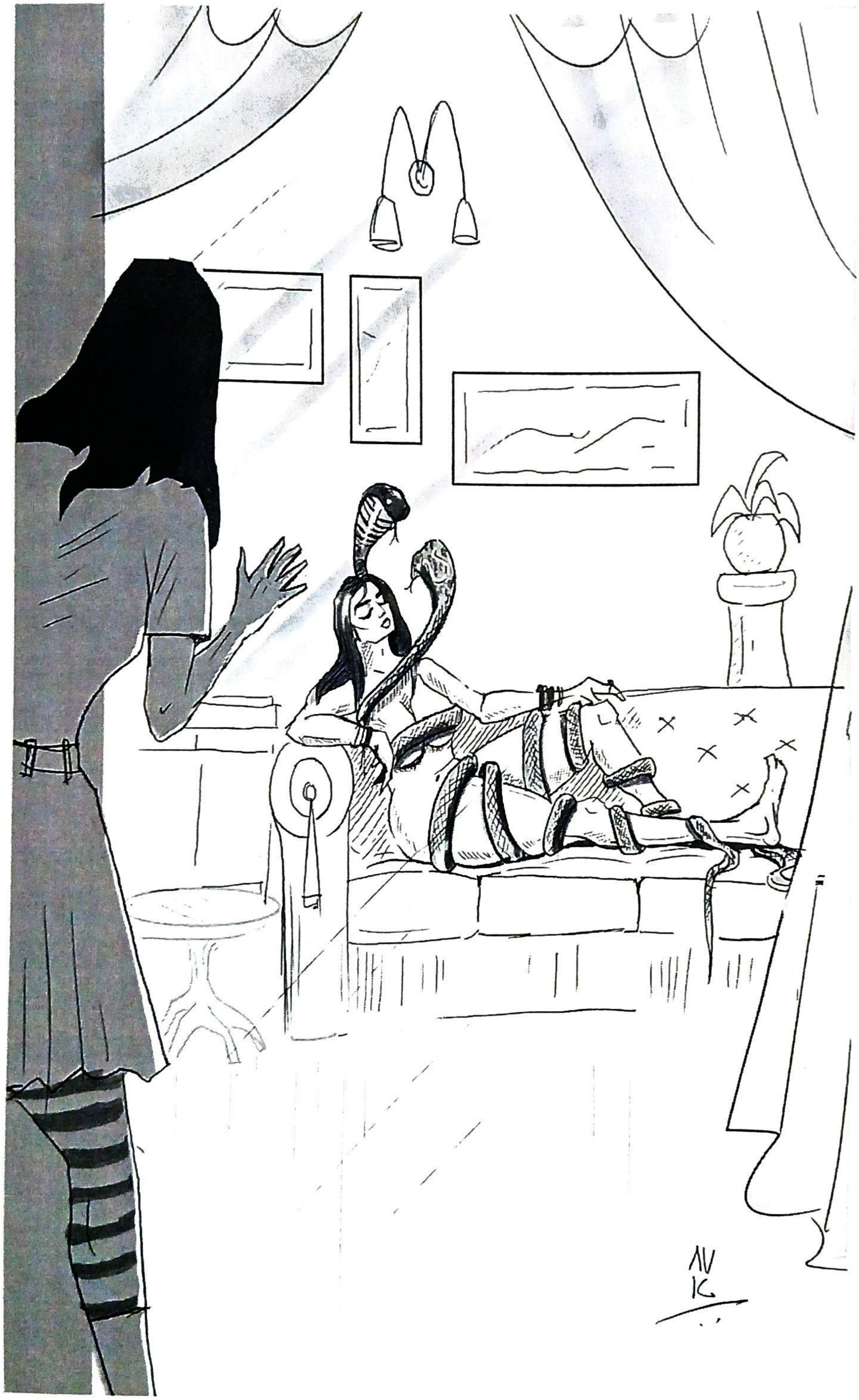
দড়িতে আবার লাফাতে শুরু করেছে কুয়াশা। আবার শোনা গেল শব্দটা, স্... সস্... সস্... স্...

ভ্রু কুঁচকে গেল কুয়াশার। কোথা থেকে আসছে এই বিরক্তিকর শব্দটা। যেন কেউ ফিসফিস্ করে কথা বলছে! চুপ করে দাঁড়িয়ে ও অপেক্ষা করতে লাগল, আবার যদি শব্দটা শোনা যায় তখন খুঁজে বের করা যাবে শব্দের উৎস। এবার অন্যরকম একটা শব্দ শোনা গেল। কোনো মহিলা যেন হঠাৎ গোঙানির স্বরে কিছু একটা বলল! কুয়াশার চোখ গেল ছোট ছাদটার দিকে। ওদিকে এই বিল্ডিংয়ের জলের ট্যাংকগুলো আছে। তারই ঠিক নিচে একেবারে গায়ে লাগানো পাঁচতলার ফ্ল্যাটটা। কুয়াশা শুনেছে একজন ডাক্তার তাঁর পরিবার নিয়ে নতুন এসেছেন ওই ফ্ল্যাটে।

কিশোর-কিশোরীদের মনের মধ্যে কৌতূহল থাকে বেশি। লাফানদড়িটা গুটিয়ে নিল কুয়াশা, তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ট্যাংকের ছাদটার দিকে। ওর বারেবারে মনে হতে লাগল নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটছে ওই ফ্ল্যাটের ভেতর! না হলে এমন অদ্ভুত সব শব্দ হওয়ার কথা নয়।

কুয়াশা লাফিয়ে নেমে এল ছাদটায়। ওর কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। হালকা শীতেও উত্তেজনার কারণে ঘাম হচ্ছে। সেটা মোছার কথাও ওর মাথায় আসছে না এই মুহূর্তে। বুকের মধ্যে দশটা হাতি যেন একসঙ্গে হাঁটাচলা করছে। হাতিগুলো ক্রমশ মত্ত হয়ে উঠছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে কুয়াশার। ও ভীতু নয়, সাঁতারের ট্রেনার প্রথম দিনেই বলে দিয়েছিলেন ভয় পেলে স্পোর্টস হয় না। তাও কেন যে আজ এমন হচ্ছে, কুয়াশা কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

ছাদের গায়ে লাগোয়া পাঁচতলার ফ্ল্যাটের ছোট হলরুমের কাঁচের দরজাটা দেখা যাচ্ছে এখন। কারও ঘরে উঁকি দেওয়া এক ধরনের অপরাধ। অথচ সেই জ্ঞানটা হঠাৎ যেন লোপ পেয়েছে কুয়াশার। কাঁচের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। গাঢ় বেগুনি রঙের পর্দায় দরজার বেশিরভাগটাই ঢাকা পড়েছে। হাতখানেক ফাঁকা জায়গা দিয়ে কেবল বাইরের আলো ঢুকছে ভেতরে। পর্দার আড়াল থেকে ঘরের



ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল কুয়াশা! কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। ঘরের ভেতরটা এই শেষ বিকেলের ক্ষীণ আলোতেও রাতের অন্ধকারের মতো কালো। স্... সস্... সস্... স্... শব্দটা এবার যেন আরও পরিষ্কার শোনা গেল। আর শোনা গেল সেই গোঙানির ভোঁতা শব্দটা।

বাইরের আলোয় এবার যেন ঘরের ভেতরটা কিছুটা হলেও দেখা যাচ্ছে। কুয়াশা দেখতে পেল একটা কালো সোফার ওপর একজন মহিলা শুয়ে আছেন। মহিলার শরীরে কোনো কাপড় নেই, সোফার একপ্রান্তে ওঁর ছড়িয়ে থাকা চুলে অসংখ্য জট পড়েছে। মহিলার ফাঁক করা ঠোঁটের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে অস্পষ্ট গোঙানির স্বর। কালো রঙের বেল্টের মতো কিছু একটা মহিলার সারা শরীরে প্যাঁচানো আছে। কুয়াশা মন দিয়ে দেখার চেষ্টা করল জিনিসগুলো আসলে কী! ওর শরীরে এখন সদ্য কৈশোরের অন্য ধরনের একটা অনুভূতি হচ্ছে। সামনে একজন বিবস্ত্র মহিলা আর অমন শরীর শিরশির করা গোঙানির শব্দ যেন কুয়াশার পায়ের দিকটা অবশ করে দিতে চাইছে ধীরে ধীরে। ওর ভালো লাগছে সামনের দৃশ্য দেখতে।

ঘরের মধ্যেকার অন্ধকারে এবার চোখ সয়ে এল কুয়াশার। ও যেন এই দৃশ্যটা দেখবে বলে পাগল হয়ে উঠেছে মনে মনে। আর ঠিক তখনই বুঝতে পারল মহিলার শরীরে বেল্টের মতো পেঁচিয়ে থাকা জিনিসগুলো আসলে কী! ওর মুখ থেকে একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে চাইল। ও পেছন ঘুরে দৌড় দিল। লাফিয়ে উঠল বড় ছাদটায়। সাথে সাথে ওর মাথাটা ঘুরে উঠল। ওর শরীর যেন চাপ নিতে পারছিল না। ও স্পষ্ট দেখেছে। একজোড়া সাপ পেঁচিয়ে আছে মহিলার শরীর। আর ওদের লোভী ফণাদুটো ঝুঁকে পড়েছে মহিলার মুখের কাছে।

ছাদের ওপরেই বমি করে ফেলল কুয়াশা। ওর মাথা ঘোরার সাথে সাথে সারা শরীর কাঁপছে। মনে হচ্ছে শরীরের ভেতর কিছু যেন একটা ঢুকে পড়েছে! সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নিজেদের তিনতলার ফ্ল্যাটে নেমে এল ও। তারপরেই হাঁফাতে লাগল। পাগলের মতো কলিং বেলের স্যুইচে আঙুল রেখে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল ও। কাজের মেয়েটি দরজা খুলেই কুয়াশার মুখ দেখে আঁতকে উঠল। তার মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে এল, “কী হয়েছে তোমার, ও দিদি?”

ঘরে ঢুকেই মাটিতে পড়ে গেল কুয়াশা। সামনের সবকিছু কেমন যেন অন্ধকার হয়ে এল ওই পাঁচতলার ফ্ল্যাটের ঘরটার মতো।

৬

২৮/৯/১৯৫৩

কেনিয়ার একটু প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেকেই ঢুকতে চায় না। সাহেবদের মতো সাহসী জাতেরাও ভয় পায়। জঙ্গলের গভীরে কী যে আছে অনেকেই জানে না। তবে কিছুদিন আগে প্রয়োজন হয়েছিল ভেতরে প্রবেশ করার। উইলিয়াম সাহেবের পাপকে চাপা দেওয়ার জন্য একটা ছোট দল ভেতরে ঢুকেছিল। আর ওদের মধ্যে যারা ফিরে এসেছে, তাদের কথা বলার ক্ষমতা নেই। এক অদ্ভুত সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিয়েছে লোকগুলোর মধ্যে। এরা বেশিরভাগই স্থানীয় আফ্রিকান অধিবাসী। তবে কিউকু প্রজাতীর কেউ নয়।

১৯৫১ থেকে কিউকুদের সঙ্গে সাহেবদের যে যুদ্ধ লেগেছে তার পরিণাম যে এত খারাপ হতে পারে কিউকুরা জানত না। আর সেই পরিণামের কারণেই আমাদের এখানে ডেকে আনা হয়েছে। আমরা পেশায় চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। যে সংক্রামক ব্যাধিটা কিছু সৈন্য আর স্থানীয় মানুষগুলোর মধ্যে দেখা দিয়েছে সেই ব্যাধির সংযোগ রয়েছে চামড়ার সঙ্গে। এই কারণেই আমাদের ডেকে আনা হয়েছে। আইরিশ ডাক্তার জেকব প্রথম এই রোগটির ব্যাপারে সাহেবদের অবগত করেন এবং সাহায্য চেয়ে একটি দল গঠন করতে বলেন, যে দলে চার থেকে পাঁচজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ অন্তত থাকে সে বিষয়ে নজর দিতে বলেন। আমাদের দলে ডাক্তার জেকব ছাড়া আরও চারজন বিশেষজ্ঞ আছেন, যার মধ্যে একজন হলাম আমি। আর বাকি তিনজন হলেন ডাক্তার এনায়েৎ হাসান, ডাক্তার লরেন্স ফন আর ডাক্তার গৌতম সেন। গৌতমই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ব্রাইট এবং সর্বকনিষ্ঠ। এই উদ্ভট রোগটার অনেকটাই ও ধরে ফেলেছে। রোগটার লক্ষণগুলো ভীষণ অদ্ভুত– প্রথমে রোগীর কথা বলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপরেই শরীরে বসন্তের দানার মতো লাল লাল গুটি বেরচ্ছে। দিন তিনেকের মাথায় চামড়ায় দেখা দিচ্ছে বড় বড় গর্ত, কারণ ওই গুটিগুলো ফেটে যাচ্ছে। তখন ওই রোগীদের কষ্ট চোখে দেখা যাচ্ছে না, ওরা কথা বলতে পারছে না কিন্তু যন্ত্রণায় পাগলের মতো আচরণ করছে। জন্তু জানোয়ারের মতো আচরণ করছে ওরা। সাপের মতো মাটিতে বুকে হেঁটে চলার চেষ্টা করছে। এই সময়ে ওই রোগীর আশেপাশে যারা থাকছে কয়েকদিনের মধ্যে তাদের মধ্যেও এই উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। আর অদ্ভুত

ব্যাপার হল নতুন কারও মধ্যে কোনো উপসর্গ দেখা দিলেই মারা যাচ্ছে সেই রোগীটি।

আমাদের কাজ করতে হচ্ছে অতিরিক্ত সাবধানতার সঙ্গে। না হলে হয়তো ওদের মতোই দশা হবে কিছুদিনের মধ্যেই। গৌতম ভীষণ সাহসী ছেলে। ওর মতো ছেলেকে ডাক্তার না হয়ে সেনায় যোগ দেওয়া উচিত ছিল। সকাল বিকেল জেকব সাহেব একবার করে এসে আমাদের কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়ে যান। আমি বা গৌতম এই রোগের কোনো কূল-কিনারা করতে পেরেছি কিনা সেটাই জানতে আসেন। আমরা রয়েছি মূলত পরীক্ষানিরীক্ষার কাজে। যদিও সাহসী গৌতম বারবার রোগীদের মধ্যে চলে যাচ্ছে। এতে ডাক্তার লরেন্স আর হাসান সাহেব খুবই বিরক্ত হচ্ছেন, এই হঠকারিতা বা অসাবধানতা ওঁরা মোটেই পছন্দ করছেন না।

বিকেল পার হয়ে আসছে। দূরে একটা বাওবাব গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তেজি সূর্যটা। আমার ঘরে ঢুকল গৌতম। ও ভীষণ হাঁফাচ্ছে। যেন সিংহের তাড়া খেয়ে ছুটে এসেছে এই অস্থায়ী হাসপাতাল সংলগ্ন ক্যাম্পটায়। আমি একটা সিগারের মুখে আগুন দিয়ে ওকে বললাম, "হাঁফাচ্ছ কেন? রিল্যাক্স... শান্ত হয়ে বসো।"

গৌতম হাঁফাতে হাঁফাতেই বলল, "ডোরেমি নামের একটা লোক কথা বলতে পেরেছে মারা যাওয়ার আগে। সে ওই দলটার সাথে জঙ্গলে গেছিল। উইলিয়াম সাহেব সাত সাতটা মেয়েকে ধর্ষণ করার পর নৃশংসভাবে খুন করেছে। ওই মৃতদেহগুলোকেই জঙ্গলের গভীরে ফেলে আসতে গেছিল ওরা। হায়নারা মড়া হোক বা পচা সবই খেয়ে সাফ করে দেয়। রাত পেরোলেই প্রমাণ লোপাট হয়ে যেত। তখন অনেক রাত। শুক্লপক্ষ থাকায় রাস্তা দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল না ওদের। সাথে বন্দুক থাকায় সিংহ বা অন্যান্য বুনো জন্তুদের ভয়ও খুব একটা ছিল না। তাছাড়া ডোরেমি ছিল পাকা শিকারী। জঙ্গলের ভেতর চার কিলোমিটার মতো উত্তরে গেছিল ওরা। আর তখনই স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্য একটা চাপা উত্তেজনা দেখা যায়। ওদের ধারণা ছিল জঙ্গলের অত গভীরে কোনো মানুষ বসবাস করে না। কিন্তু ওদের ভুল প্রমাণ করে দিয়েছিল ওদের সামনে ঘটতে থাকা ঘটনা। ভয়ংকর দর্শন চার পাঁচজন কিউকু পুরুষ জঙ্গলের মধ্যে আগুন জ্বেলে কিছু একটা করছিল। ওরা ছিল নিরস্ত্র। একমানুষ সমান একটা মূর্তির

সামনে ওরা গোল হয়ে ঘুরছিল আর নিজেদের ভাষায় একটা গান গেয়ে চলেছিল একনাগাড়ে।

স্থানীয় একজন আধিবাসী চাপা স্বরে শুধু উচ্চারণ করেছিল একটা শব্দ, 'মামি ওয়াটা...'

সঙ্গে সঙ্গেই যেন বাকি আদিবাসীদের মধ্যে একটা চাপা চাঞ্চল্য তৈরি হতে শুরু করেছিল। তখনও ওদের কাঁধে ছিল কিউকু রমণীদের ভারী মৃতদেহ! হঠাৎ করেই থেমে গেছিল কিউকু যুবকদের গান। ওদের মধ্যে একজন পেশীবহুল চেহারার ছেলে দেখতে পেয়েছিল ডোরেমিদের দলটাকে। আর সাথে সাথেই খালি হাতে আক্রমণ করেছিল। অস্ত্রধারী ডোরেমি প্রথমটায় কিছুটা চমকেই গেছিল। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে গুলি ছোড়া শুরু করেছিল কিউকু যুবকদের দিকে। আদিবাসীদের দলটার মধ্যে যে মূর্তিটা দেখে চিনতে পেরেছিল সে চিৎকার করে উঠেছিল, সাহেব গুলি চালিও না। ওদের রক্ত ওই মাটিতে পড়লে অনর্থ হয়ে যাবে। নেমে আসবে মহামারি।

ডোরেমিকে ততক্ষণে পেয়ে বসেছে রক্তের নেশা। সে কারও কথায় কান দেওয়ার অবস্থায় ছিল না। পরপর তিনজন ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিল ওর গুলিতে। একজন দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল মূর্তিটার পায়ের কাছে। আর তখনই দুটো আলকাতরার মতো কালো রঙের সাপ কোথা থেকে এসে যেন পেঁচিয়ে ধরেছিল মূর্তিটাকে। আদিবাসী লোকটা আবার চেঁচিয়েছিল, গুলি কোরো না সাহেব। ঈশ্বরের রোষকে ভয় করো।

ডোরেমি তখন পাগলের মতো অবস্থায় চলে গেছিল। মানুষটার সাথে সাথে ওই মূর্তি আর তার সাথে লেপ্টে থাকা সাপদুটোকেও ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। তারপর নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছিল জঙ্গলের পথ ধরে। ছেড়ে রেখে এসেছিল মৃতদেহগুলো হায়নাদের ভোজের জন্য।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কি মনে হয় এর পর থেকেই এইসব রোগব্যাধি শুরু হয়েছে?"

খুব আস্তে মাথা নাড়ল গৌতম। বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম প্রভেদ থাকে, সেই প্রভেদটা হঠাৎ করে কোনো চ্যালেঞ্জের মুখে এসে যখন দাঁড়ায় মানুষ নিজেকেই চিনতে পারে না। গৌতমকে দেখে ঠিক তেমন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে বলেই মনে হল আমার।

আমি একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ওকে বললাম, “বিজ্ঞানের ছাত্র আর তার ওপরে এত প্রতিভাবান একজন ডাক্তার হওয়ার পরেও তুমি এসব আফ্রিকান বুজরুকিতে বিশ্বাস করো?”

খানিকটা সময় নিল গৌতম। আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট ও। ওকে কখনোই আমার সামনে ধূমপান করতে দেখিনি। কী হল জানি না। ও হাতটা বাড়িয়ে আমায় বলল, “স্যার একটা সিগার দেবেন?”

রুপোর সুসজ্জিত কেস্ থেকে বের করে একটা সিগার ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। সেটা জ্বালিয়ে চোখ বন্ধ করে অনেকটা ধোঁয়া টেনে ধীরে ধীরে ছেড়ে ও বলল, “কাউকেই সাপে কামড়ায়নি, অথচ সাপের বিষের নমুনা প্রত্যেকের রক্তে পাওয়া যাচ্ছে। এই গল্পটা আমারও বিশ্বাস হচ্ছিল না স্যার! তবে মৃত্যুপথযাত্রীর কথা অবিশ্বাস করি কেমন করে। আর নমুনাগুলো যে মিথ্যে নয় তাও আপনি ভালো করেই জানেন!”

“হাবুল... এই হাবুল!”

হাবুলের মনোযোগ ঘেঁটে গেল মায়ের ডাক শুনে। পুকুর পাড়ে মাটির তলা থেকে এমন একটা খাতা যে খুঁজে পাবে এটা ও স্বপ্নেও ভাবেনি। আর অদ্ভুত ব্যাপার হল জিনিসটা এখনও ভালো আছে। পুকুর পাড়ের ভেজা জমির সংস্পর্শে এসে এই খাতাটা কবেই নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা! কীভাবে যে এটা ঠিক আছে সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। ছোড়দাদু ছিলেন সাহেব আমলের ডাক্তার। তাঁরই খাতা এটা। ও বাবার মুখে শুনেছিল বটে যে, ছোড়দাদু একবার কেনিয়া গিয়েছিলেন ডাক্তারির কাজে। পুকুর পাড়ে প্যান্ডেল করা হয়েছিল। ডেকোরেটর বলেছিল, জমি ভিজে তাই একটু বেশিই খুঁড়তে হবে। দিদিভাইয়ের বিয়ের জন্য যে প্যান্ডেল তৈরি হয়েছিল তার নিচে যে এমন একটা খাতা থাকতে পারে কেউ আন্দাজই করেনি। যে ছেলেটা প্যান্ডেল খুলছিল সেইই এসে হাবুলের হাতে দিয়েছিল চামড়ার ব্যাগটা। সে বলেছিল, মাটি থেকে বাঁশ ওঠাতে গিয়ে এটা বেরিয়ে এসেছে। আরও একটা জিনিস বেরিয়ে এসেছে ব্যাগটার সঙ্গে। সেটা হল একটা ফুট চারেক লম্বা লাঠি। যেটা দেখে মনে হচ্ছে দুটো প্যাঁচানো সাপ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে!

লাঠিটা আর চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে হাবুল দৌড়ে চলে গেল চিলেকোঠার ঘরে। এটাই ওর সাম্রাজ্য। পড়ার টেবিলের ওপর চামড়ার ব্যাগটা থেকে বের করে

খাতাটা রাখল। আর লাঠিটা রেখে দিল চৌকির নিচে লুকিয়ে। মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে নিজের সমস্যা নিজেই ডেকে এনেছে। এবার অপরাধীদের মতো গিয়ে দাঁড়াতে হবে ওকে মুখ কাঁচুমাচু করে।

৭

পাঁচতলার ফ্ল্যাটে পর পর কয়েকবার কেউ অধৈর্য হাতে কলিং বেল বাজিয়ে গেল। গৌরব কিছুটা বিরক্তই হল। রূপার আজ প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। তাই আগেই ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়েছে ও। গৌরবের বিরক্তির এটাও একটা কারণ, মাথার যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে হয়তো মেয়েটা সবে ঘুমিয়েছে, তার মধ্যে এই বেয়াড়া কলিং বেলের শব্দে ও আবার না জেগে যায়!

দরজা খুলেই একজন অপরিচিত মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল গৌরব। ভদ্রলোকের চেহারায় কেমন যেন একটা চিন্তার ছাপ পড়েছে। কেমন যেন একটা অস্থিরতা রয়েছে হাবভাবে।

গৌরব সরাসরি জিজ্ঞেস করল, “কাকে চাই?”

ভদ্রলোক কিছুটা হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, “আমি অমল চৌধুরি! এই বিল্ডিংয়ের তিন তলাতেই আমার ফ্ল্যাট। বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এত রাতে আসতে বাধ্য হলাম। আসলে আমার মেয়ে খুব অসুস্থ। আজ বিকেল অবধি সব ঠিক ছিল। তার পর থেকেই ও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কাজের দিদি বলছিল, ও ছাদে উঠেছিল স্কিপিং করতে। নেমে আসার পর থেকেই...”

“কী হয়েছে কী আপনার মেয়ের?” প্রশ্ন করল গৌরব।

অমল চৌধুরী আবার বলতে শুরু করলেন, “প্রবল জ্বর। একশো চারের কাছাকাছি টেম্পারেচার, প্যারাসিটামল দেওয়া হয়েছে, তাও কমছে না। সারা শরীরে বসন্তের গুটির মতো লাল লাল কীসব বেরিয়েছে। ও কথাও বলতে পারছে না। শুধু গোঁ...গোঁ... করে একটা ভোঁতা শব্দ করে যাচ্ছে। এই রাতে কোনো ডাক্তার পাচ্ছি না, অ্যাম্বুলেন্সে যোগাযোগ করেও ফল পেলাম না। ওদের আসতে আরও একটি ঘণ্টা সময় লাগবে। সিকিওরিটির ছোটন বলল আপনি নাকি ডাক্তার। তাই বাপ হয়ে আর ঘরে বসে থাকতে পারলাম না।”

গৌরব বলতে যাচ্ছিল যে, ও তো এসব কেস্ বিশেষ দেখে না, ওর

স্পেশালিটি হল ক্রিটিকাল রুগীদের অস্ত্রপ্রচার করা। কিন্তু কিছু আর বলল না। ডাক্তার হিসেবে একটা কর্তব্য থেকেই যায়। অমল চৌধুরির সাথে গৌরব বেরিয়ে এল ফ্ল্যাটের বাইরে। সাথে নিজের ব্যাগটা নিতে ভুলল না।

মেয়েটাকে দেখে প্রথমে কিছুটা চমকেই গেল ডাক্তার গৌরব সেন! সাধারণ গুটি বসন্তের লক্ষণ এমন হয় না। মাত্র এক বেলার মধ্যেই সারা শরীরে প্রচুর র‍্যাশ বেরিয়েছে। ও ঝুঁকি নিতে চাইল না। সরাসরি ফোন করল ওর পরিচিত এক চর্মরোগ বিশেষজ্ঞকে। এই রাত একটার সময়ও ডাক্তারবাবু ফোন ধরলেন। তারপর ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "বলো গৌরব, এত রাতে! কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি?"

"স্যার! একবার কথায় কথায় ডাক্তার গৌতম সেনের একটা রিপোর্ট নিয়ে আপনি কিছু বলেছিলেন মনে আছে? আমি এই মুহূর্তে এক পেশেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ডাক্তার সেনের রিপোর্টে যে রোগের কথা বলা হয়েছিল সেই রোগের উপসর্গের সঙ্গে যেন এই পেশেন্টের রোগের অদ্ভুত মিল আছে বলে মনে হচ্ছে!" খুব চাপা গলায় কথাগুলো বলল গৌরব।

ফোনের এপ্রান্তে কিছুটা চিন্তিত দেখাল অন্য ডাক্তারটিকেও। অস্ফুটে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "মামি পক্স! কিন্তু সে রোগ এতবছর পর তাও আবার এই দেশে এবং আমার নিজের শহরে কীভাবে এল!"

মেডিকেল কলেজে একবার একটা সেমিনারে ডাক্তার সত্য ঘোষাল এই রোগ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। যে সেমিনারে ডাক্তার গৌরব সেনও ছিল। ডাক্তার গৌতম সেন ছিলেন সত্য ঘোষালের গুরুদেব। তিনি একবার আফ্রিকা গেছিলেন এক আইরিশ ডাক্তারের আমন্ত্রণে। সেখানে গিয়েই এই নতুন ধরনের একটি রোগের সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। ভারতে ফেরার পরে তিনি একটি রিপোর্ট তৈরি করেন, যেটি প্রকাশ পায় সেই সময়ের বড় বড় মেডিকেল জার্নালে। এই রোগের উপসর্গ ছিল– প্রথমে রোগীর কথা বন্ধ হয়ে যাওয়া, তার পর প্রবল জ্বর ও চামড়ায় র‍্যাশ। এবং শেষে সেই র‍্যাশগুলো ফেটে রোগীর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু! ডাক্তার সেন ও তাঁর এক বন্ধুর তৎপরতায় এই রোগের হাত থেকে বাঁচানো গেছিল বেশ কিছু মানুষকে। এই রোগের অ্যান্টিডোট প্রস্তুত করা গেছিল অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে।

সত্য ঘোষাল আর সময় ব্যয় না করে বললেন, "ওই বাড়ির প্রত্যেককে

অ্যান্টি অ্যালার্জিক ইঞ্জেকশন দিয়ে দাও ইমিডিয়েটলি, আর এক্ষুনি খেয়াল করো অন্য কারও কথা বন্ধ হয়ে গেছে কিনা! পেশেন্টকে অবিলম্বে আমাদের হাসপাতালে পাঠাও। আমি রওনা হচ্ছি যত দ্রুত সম্ভব।"

বাড়ির প্রত্যেককে পরীক্ষা করে দেখল গৌরব। নাহ্‌, আর কারও মধ্যে কোনো উপসর্গ দেখা যাচ্ছে না। স্পেশাল অ্যাম্বুলেন্স চলে এল দশ মিনিটের মধ্যে। কিট্ পরা কিছু মেডিকেল স্টাফ এসে কুয়াশাকে নিয়ে চলে গেল। বাড়ির সকলকে অ্যান্টি অ্যালার্জিক ইঞ্জেকশন দেওয়া হল।

গৌরব নিজেও আর ফ্ল্যাটে ফিরল না। ও গাড়ি বের করল হাসপাতাল যাবে বলে। ওর গাড়িতেই উঠে বসলেন অমল চৌধুরি। হাজরা মোড় পার করতে করতে তিনি প্রথম কথা বললেন, "আমার মেয়েটা বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?"

"দেখুন আপনাকে একটা কথা সোজাসুজি বলে রাখা ভালো। যে রোগটা আপনার মেয়ের হয়েছে বলে আমার ধারণা, সেই রোগ এদেশের মানুষের কখনো হয়নি। যদিও সবটাই আমার অনুমান। কারণ, এই রোগের সম্পর্কে একটা সেমিনারে আমি জেনেছিলাম। উপসর্গগুলো মিলে যাচ্ছে বলেই আমি এই শহরের সবচেয়ে ভালো একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের সাজেশন নিয়েছি। তিনিই আপনার মেয়েকে দেখবেন আপাতত। যদি আমার অনুমান সঠিক হয়, সেক্ষেত্রে জানি না কী হবে! ওই যে বললাম এদেশে এই রোগ কখনো কারও হয়নি। এর ওষুধ আদৌ এখানে পাওয়া যাবে কিনা তাও আমার জানা নেই। যদিও ডাক্তার সত্য ঘোষালের জানা আছে কিনা তা আমি জানি না। তবে ডাক্তার ঘোষালের কাছেই শুনেছি, এই রোগে শরীরে একপ্রকার বিষক্রিয়া হয়। যে বিষের ধর্ম অনেকটা সাপের বিষের মতো। এবার দেখা যাক। হোপ ফর দ্য বেস্ট। আর আপনাকে একটাই কথা বলল, এই মুহূর্তে ভেঙে না পড়ে শক্ত থাকতে হবে।"

গৌরবের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন অমল চৌধুরি। ভাবার চেষ্টা করতে লাগলেন এইসব শোনার পরে কীভাবে শক্ত থাকা যায়!

৮

আজ রূপার অষ্টমঙ্গলা! রূপার মা উদাস চোখে চেয়ে ছিলেন ঘড়ির দিকে। একটু আগেই ফোনে কথা হয়েছে মেয়ের সঙ্গে, সে জানিয়েছে সে আসছে না। গৌরব

কাল রাতেই হাসপাতালে চলে গেছে। এখনো ফেরেনি। সকাল থেকে রূপা তার বরকে অনেকবার ফোন করেছে, কিন্তু একটাই উত্তর ভেসে এসেছে ফোনের ওপ্রান্ত থেকে– ডায়াল করা নম্বরটি বর্তমানে পরিষেবা সীমার বাইরে আছে অথবা বন্ধ আছে!

রূপার মা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে সময়কেই দোষারোপ করছিলেন। তখনই দেবেশ নিয়োগী ঘরে ঢুকলেন। সকাল সকাল উঠে তিনি বাজার করে এনেছেন। অথচ যে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাজার-হাট করা সেই অনুষ্ঠানটাই হবে না।

"রুপু কিছু বলল নাকি?" স্ত্রীকে দেবেশ নিয়োগী প্রশ্ন করলেন।

মনের ভার চাপা দিয়ে আঁচলে চোখ মুছলেন রূপার মা। তার পর কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন, "ওরা আসবে না। জামাই কাল রাত থেকে হাসপাতালে আছে। সকাল থেকে তাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"ওদের মধ্যে সব ঠিকঠাক আছে তো!" চিন্তিত দেখাল দেবেশ নিয়োগীকে।

"আমি জানি না!" ছোট্ট উত্তর দিলেন রূপার মা।

কিন্তু কোনো এক কারণে দেবেশ নিয়োগীর চিন্তাটা কমল না। বহু বছর আগের কথা মনে পড়ল। তাঁর ছোট পিসির বিয়ে হয়েছিল অনেক কম বয়সে। তখন সবে সবে ছোট কাকা দেশে ফিরেছেন। বিয়ের পর থেকেই ছোট পিসির মধ্যে কেমন একটা যেন পরিবর্তন দেখা গেল। ওরাও অষ্ট মঙ্গলার দিন আসেনি। ঠাকুর্দা গাড়ি পাঠিয়েছিলেন সে গাড়ি কাউকে না নিয়েই ফিরে এসেছিল। পিসেমশাই নাকি অন্য কোনো নারীতে আসক্ত ছিল, সেটা কেউ জানতই না। কিছুদিন পরেই খবর এসেছিল পিসি জলে ডুবে মারা গেছে।

ছোট কাকা বলতেন এবাড়ির মেয়েরা কখনো সুখী হবে না। কী যেন এক শাপ লেগেছে ওদের পরিবারের ওপর। যদিও সেই পিসির বিয়ের এত বছর পরে আবার কোনো মেয়ের বিয়ে হল এ বাড়িতে। তাই কিছুটা চিন্তিত হয়েছেন দেবেশ নিয়োগী। ওঁর পিসির মতোই ভবিতব্য লিখে আনেনি তো ওঁর নিজের মেয়ে!

বীরেশ্বর নিয়োগী বাড়িতে ঢুকে যেমন উৎসবের মহল পাবেন ভেবেছিলেন তেমন হতে না দেখে বেশ চটে গেলেন। চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিলেন, তিনি এখুনি কলকাতা যেতে চান আর ভাইঝি আর তার বরকে নিয়ে আসতে চান। বাধা দিলেন দাদা দেবেশ নিয়োগী। আর কটা দিন দেখে না হয় কলকাতা যাওয়া যাবে।

মেয়ে সুখে আছে কিনা দেখে আসা যাবে!

সেই সময়েই ভেতর বাড়ি থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল ভোলা। সে প্রচণ্ড হাঁফাচ্ছে। গলা থেকে যেন আওয়াজ বার করতেই কষ্ট হচ্ছে তার। হাঁফাতে হাঁফাতেই সে বলল, "ছোটকর্তা কথা বলছেন গো বাবু! কালসর্প... না কীসব যেন বলছেন... এক্ষুনি চলেন।"

দেবেশ আর বীরেশ্বর ভোলার পেছন পেছন ছুটলেন ভেতর বাড়ির দিকে। ঘরটায় ঢুকেই নাকে হাত চাপা দিলেন বীরেশ্বর। তাঁর গা গুলিয়ে উঠেছে ঘরের মধ্যে পাক খেতে থাকা বিশ্রী গন্ধে। কোনো জীবিত মানুষের ঘরে এমন গন্ধ থাকতে পারে না।

কঙ্কালসার ত্রিলোকেশ্বরের ঠোঁটের ফাঁক দিলে লালা গড়িয়ে পড়ছে! ফেনার বুড়বুড়ি কাটছে মুখ ফাঁক করার সাথে সাথে। অতি কষ্টে শ্বাস নিচ্ছেন যেন তিনি। দেবেশের বিষয়টা ভালো লাগল না। মনে হল ওঁর কাকার হাতে আর বেশি সময় নেই।

ত্রিলোকেশ্বর হাত নেড়ে কাছে ডাকলেন দেবেশকে। দেবেশ কাকার মুখের কাছে কানটা নিয়ে গেলেন। দম আটকে রইলেন যাতে ওই বিশ্রী গন্ধটা সহ্য করতে না হয়!

শ্বাস জড়ানো গলায় ত্রিলোকেশ্বর বললেন, "দেবু... তোর মেয়ে বাঁচবে না বেশিদিন। কালসর্প ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে সেই অভিশাপ। তোর মেয়ে আর মানুষ নেই রে। ও আর বাঁচবে না। আর..."

কথা বন্ধ হয়ে গেল ত্রিলোকেশ্বর নিয়োগীর। দেবেশ চোখ তুলে দেখলেন তাঁর কাকার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে। চোখ থেকেই প্রাণটা বেরিয়ে গেছে বোধহয়! আজ দিনটা কেমন হওয়ার কথা ছিল অথচ কেমন সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল। এসব কী বলে গেলেন কাকা, মারা যাওয়ার আগে এই কথা বলে যাওয়ার মানেই বা কী!

৯

হাসপাতাল থেকে ফিরে রূপাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল গৌরব। এই মেয়েটা কে! একে তো সে চেনে না। সেই রূপ সেই লাবণ্য কোথায় গেল। রূপার গায়ের রঙ

একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে কাল রাত থেকে আজ দুপুরের মধ্যে। ঘোর কালো অন্ধকারে যেন ঢেকে গেছে সারা শরীর। অথচ এমন হওয়ার কথা নয়।

খাটের মধ্যে শুয়ে শুয়ে সারা শরীরটাকে মোচড় দিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। যেন কোনো মানুষ নয়, যেন কোনো সরীসৃপ ভর করেছে মেয়েটার ভেতর। চুলগুলো কেমন যেন ধূসর আর জট পাকানো লাগছে রূপার। মেয়েটার শরীরে কোনো কাপড় নেই।

রূপাকে দেখে ভয় লাগল গৌরবের। সাধে কি আর কথায় আছে দশ কথার পরে বিয়ে হওয়া উচিত! উল্লাসের কথায় রাজি হয়ে যাওয়া মোটেও ঠিক হয়নি। কিন্তু কিছু করারও তো ছিল না। বাবা পঙ্গু হয়ে গেছিলেন। ডাক্তারি করা বন্ধ হয়ে গেছিল ধীরে ধীরে। বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল অভাব। তার পর হঠাৎ করেই মারা গেলেন গৌরবের বাবা! পঙ্গু মানুষটার পেছনে বেরিয়ে গেছিল তাঁর রোজগার করা টাকার সবটুকু। এই মৃত্যুর অভিঘাত গৌরবের মা-ও সহ্য করতে পারেননি। তিনি একধরনের মানসিক রোগের শিকার হন স্বামীর মৃত্যুর পরেই। রোগ সারানো গেছিল বটে কিন্তু তার জন্য বসতবাড়িটাও বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার টাকা ছিল না গৌরবের। ছাত্র হিসেবে সে বরাবরই ভালো ছিল, তাই কিছু টাকা স্কলারশিপ হিসেবে জোগাড় করা গেলেও বাদবাকিটা দেওয়ার কেউ ছিল না। তখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল উল্লাস! ওর বন্ধু উল্লাস বিনা স্বার্থে এতকিছু করেছে ওর জন্য, বদলে চায়নি কিছুই। এই তো প্রথমবার কিছু চাইল। মন থেকে খারাপ ভাবনাটা তাড়িয়ে রূপার দিকে এগিয়ে গেল গৌরব।

"এই শুনতে পাচ্ছ! তোমার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে?" ভীত গলায় জিজ্ঞেস করল গৌরব।

কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু শোনা গেল একটা প্রাণ জল করে দেওয়া শব্দ। সাপ যেমন শব্দ করে তেমন শব্দ। সস্... স্... সস্...

আর সাথে সাথেই মাটিয়ে নেমে পড়ল রূপা। মেঝের ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে চলতে লাগল ঘরের শেষ প্রান্তের দিকে। ওদিকে আর একটু এগিয়ে গেলেই ছাদে যাওয়ার কাঁচের দরজা। গৌরব প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল এমন হতে দেখে। মানুষ সাপের মতো বুকে হেঁটে চলছে কেন! পরক্ষণেই ওর মনে হল, হতেও পারে এটা কোনো মানসিক অসুখ। কোনো মানসিক অসুখের কারণে এমন অদ্ভুত আচরণ করছে ওর স্ত্রী!

গৌরব ছুটে গিয়ে চেপে ধরল রূপাকে। সেই সময়ই নিভে গেল ঘরের আলোটা। খসখসে একটা কিছুকে ধরার অনুভূতি হল গৌরবের। মানুষের শরীর এমন হয় না। কী অসম্ভব ঠান্ডা সেই শরীর!

"না না, এ হতে পারে না... কোনো মানুষ এমন হতে পারে না..."

চিৎকার করে উঠল ডাক্তার গৌরব সেন। যার চিন্তাভাবনা শুধুই বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত, তার সমস্ত বিশ্বাস যেন এক লহমায় টলে যাচ্ছে। বাবার কথাই কি তাহলে সত্যি! বাবা বলতেন– বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষিত তৈরি করে বটে, কিন্তু বিজ্ঞান কখনোই কোনো কিছুকে অমান্য করতে শেখায় না। অর্ধ শিক্ষিত মূর্খরাই শুধু বিজ্ঞানের পতাকা কাঁধে তুলে অহেতুক তর্ক করে।

"কী হতে পারে না?"

চমকে উঠল গৌরব। ঘরের আলো জ্বলছে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে রূপা। ওর দিকে কিছুটা ঝুঁকে আছে মেয়েটা। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েও আছে।

"কোন মানুষের আবার কী হল?" আবার প্রশ্ন করল রূপা।

"তুমি বুকে হেঁটে মেঝে দিয়ে যাচ্ছিলে!"

গৌরবের কথা শুনে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল রূপা। হাসি যেন থামতেই চাইল না বেশ কিছুক্ষণ। গৌরবের ভেতরটা কেমন যেন শিউরে উঠল সেই হাসির শব্দ শুনে। হাসতে হাসতেই রূপা বলল, "কাল রাত থেকে খুব চাপ গেছে বুঝতে পারছি। আমি এই ঘরে ছিলামই না। আপনি আমায় দেখলেন কেমন করে। আর এই দেখুন আমি তো নিজের পায়েই হাঁটছি। শুধুশুধু বুকে হাঁটতে যাব কেন, আমি কি টিকটিকি না সাপ?"

"না, মানে, তাহলে..."

মুখ থেকে আর কথা সরছিল না গৌরবের। ও যা দেখেছে সবটাই কি ভুল ছিল! নিচের ফ্ল্যাটের মেয়েটার রোগ কি ওর মাথায় দানা বেঁধেছে! রিপোর্ট বলছে মেয়েটা কোনো এক প্রজাতির সাপের বিষে আক্রান্ত। সেইসব ভাবনা থেকেই কি ও তাহলে নিজের স্ত্রীকে সাপের সঙ্গে কল্পনা করে নিল! কিন্তু কেন? এমন তো হওয়ার কথা নয়।

"আপনি বসুন আমি চা নিয়ে আসি।"

রূপার চোখের ভাষায় কিছু একটা ছিল। সারা শরীরে কেমন যেন শিহরন খেলে গেল গৌরবের। একেই কি কামনা বলে! মনে হল মেয়েটাকে এক্ষুনি আদরে

আদরে পাগল করে দিক ও।

রূপা চা নিয়ে এসে দাঁড়াল গৌরবের সামনে। গৌরব নিজেই চায়ের কাপগুলো টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। তার পরেই নিজের ঠোঁটটা নামিয়ে আনল রূপার ঘাড়ের কাছে। দীর্ঘ চুম্বনে কেঁপে উঠল রূপার পায়রার মতো নরম অথচ সাপের মতো সরু শরীরটা।

সমর্পণ করে দিয়ে ভালো লাগল রূপার। ও কিছুই করল না। গৌরবই অধৈর্য হাতে ওকে বেআব্রু করে ফেলল নিমেষের মধ্যে। ঘরের আলো নেভানোর কথাও কারও মনে রইল না।

১০

শ্মশান থেকে ফিরতে বেশ রাত হল হাবুলদের। আজ যাঁর দেহটা ছাই হয়ে গেল তাঁরই দুটো জিনিস এখন হাবুলের জিম্মায়। ছোড়দাদুর মৃত্যুর পরে তাঁর খাতা পড়ার নেশা যেন আরও জাঁকিয়ে বসেছে ক্লাস টেনের হাবুলের মাথায়।

ও খুব সন্তর্পণে পৌঁছে গেল চিলেকোঠার ঘরে। আলো জ্বালল খুব সাবধানে, যাতে মা বা জেঠিমা নিচ থেকে আলোটা দেখতে না পায় সেই ব্যবস্থা করল ও। কাঁচের জানালায় একটা খবরের কাগজ এঁটে দিল কৌশল করে। তারপর খুলে ফেলল খাতাটা।

প্রথম পাতায় যে তারিখ দেওয়া হয়েছিল পরের পাতায় তার বেশ কয়েক দিন পরের তারিখ থেকে লেখা শুরু করা হয়েছে–

১/১০/১৯৫৩

'মামি ওয়াটা' এই নামটা উচ্চারণ করতেই অনেকে ভয় পায়। স্থানীয় আদিবাসীদের কাছে এই নামটা যেন একটা বিভীষিকা! অনেকে এই দেবীকে জলের দেবী বলে আবার অনেকে বলে সাক্ষাৎ মৃত্যু। অসীম আর অবাধ যৌনতার প্রতীক এই দেবী। এই দেবীর মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে স্থানীয় রমণীদের আদলে। আফ্রিকান নারীদের মতো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ইনি। প্রধানত এই দেবী কৃপা করলে অনুর্বর জমিতেও ফসল ফলে আর রেগে গেলে নেমে আসে মহামারি। হাসপাতালের পাশে যে টেন্ট করা হয়েছে সেখানে এসেছিল স্থানীয় এক বৃদ্ধ।

তাঁরই মুখে এসব কাহিনি শুনছিলাম আমি আর গৌতম।

আমাদের কাজের তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। বরং আরও দু'জন রোগী মারা গেছে এই কয়েক দিনে। তবে একটা জিনিস পাওয়া গেছে। সেটা আমাদের চিকিৎসার পথে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে। রোগীদের শরীরে সাপের বিষের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যে বিষের ধরনটা আমাদের কাছে বেশ অচেনা। আয়ারল্যান্ডের ল্যাবে কিছু নমুনা ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাগ্যিস সাহেবদের প্রাইভেট জেট ছিল! নাহলে এত দ্রুত কাজ করা সম্ভবপর ছিল না।

২/১০/১৯৫৩

এই প্রথম কোনো রোগী বেঁচে উঠল আমাদের চেষ্টায়। সে কথা বলতে পারছে বটে। কিন্তু আইরিশ ডাক্তারটির অনুমান ধীরে ধীরে পঙ্গু হয়ে যাবে লোকটা। স্যার জেকব রুগীকে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। হাসান সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমকে অবশ্যই তারিফ করতে হয়। ওঁর মতো ডাক্তার না থাকলে রোগী বাঁচত না।

গৌতম সন্ধ্যের পরে একটা প্রস্তাব নিয়ে এল আমার কাছে। ও ওই জায়গাটায় একবার যেতে চায়, যেখানে এই মানুষগুলো প্রথম ওই মূর্তিটা দেখেছিল। যাওয়া উচিত কিনা সে ব্যাপারে আমি কী মতামত দেব বুঝতে পারলাম না। ডাক্তার হিসেবে বলা উচিত সেখানে অবশ্যই একবার গিয়ে দেখতে হবে। না হলে বোঝা যাবে না সাপের বিষ রোগীদের শরীরে এল কীভাবে! আর একজন মানুষ হিসেবে মনে হচ্ছে প্রকৃতির কিছু রহস্য ভেদ না করাই ভালো।

৮/১০/১৯৫৩

অবশেষে অনেকেই সেই জায়গাটায় যাওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন। ডুমা নামের একজন কুলি সেই পথ চেনে। সেই পথের হদিস ডোরেমি সাহেবদের ডুমাই দিয়েছিল। ও আমাদের নিয়ে যাবে বলে কথা দিল। ডাক্তার লরেন্স, আমি আর গৌতম সেই অভিযানে যাব বলে ঠিক করা হয়েছে আপাতত।

১০/১০/১৯৫৩

সকাল থেকে অনেকটা পথ আমরা চলে এসেছি জঙ্গলের গভীরে। বুনো

লতাপাতার আড়ালে অনেক সময়েই আলো দেখা যাচ্ছে না। এখানে মাছি, সাপ, চিতা, হায়না, সিংহ সবকিছু থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। লরেন্স সাথে একটা বন্দুক এনেছে। আমার পূর্বপুরুষেরা বন্দুক চালনায় পারদর্শী হলেও আমি কখনো এয়ারগানও চালাইনি। জঙ্গলের অধিকাংশ জায়গাই রুক্ষ। এত রুক্ষ জায়গায় জন্তু জানোয়ারের ভয় থাকার কথা নয়। জলের কাছাকাছি ওরা থাকতে ভালোবাসে।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসার আগেই আমরা যতদূর পৌঁছব সেখানেই টেন্ট করা হবে, এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১২/১০/১৯৫৩

টানা দু'দিন ধরে শ্বাপদসংকুল পথে চলার পরে একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখা গেছে। কাল গৌতম অনেকটাই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এখন ওকে বেশ চনমনে দেখাচ্ছে। ডুমা একটা ছোট ছোরা দিয়ে গাছের ডাল কেটে আগুন করতে করতে বলল, "ওই যে জঙ্গলের উত্তর দিকে কিউকুদের কিছু মানুষকে দেখা যায় মাঝে মাঝে। আপনারা ওদের অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। প্রতিবাদ করতে গেলে রক্ত দিয়ে সেই প্রতিবাদের খেসারত দিতে হয়। ওদের মহিলাদের খুন করেছেন, বলাৎকার করেছেন। তাই ওরা আর চুপ করে থাকতে পারেনি। কে না জানে এই ভূমি হল জাদুবিদ্যা আর কালো দুনিয়ার এক অদ্ভুত নজির। ঘানা, কেনিয়া, ক্যামারুন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে কালোবিদ্যা। ভুডু, ব্ল্যাক ম্যাজিক। ওরা যখন আর কষ্ট সহ্য করতে পারে না, তখন ওরা স্মরণ নেয় এই কালো দুনিয়ার দেব-দেবীদের কাছে। মামি ওয়াটা নিজের সন্তানদের রক্ষা করতে এসেছেন, তাঁর কোপেই লেগেছে এই মহামারি। তবে পাপীর শাস্তি হবে, তারপর সব শান্ত হয়ে যাবে।"

তাঁবুর সামনে বসে আমরা তাকালাম ডুমার দেখানো জঙ্গলটার দিকে। অস্বীকার করব না, সত্যিই গা ছমছম করে উঠল। মনে হল, জায়গাটা যেন এই পৃথিবীর কোনো অংশ নয়!

১৩/১০/১৯৫৩

দিনের আলোতেই মূর্তিটা দেখে গা ছমছম করে উঠল। জটাভারে মাথা নুয়ে পড়তে চাইছে যেন একজন আফ্রিকান মহিলার। ওটা যে একটা মূর্তি সেটাই

যেন বিশ্বাস করা দায়। মনে হচ্ছে সত্যি কোনো জীবন্ত মহিলা বসে আছেন বেদির ওপর। মূর্তিটাকে আরও ভয়ংকর দেখাচ্ছে বুলেটের ক্ষতর কারণে। ডোরেমি মূর্তিটাকে প্রায় ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। অবাক হতে হয় এটা ভেবে যে, অতগুলো গুলির আঘাতের পরেও মূর্তিটা এখনও টিকে আছে! সাধারণ কাঠ বা মাটি দিয়ে যদি জিনিসটা তৈরি হত তাহলে অতগুলো গুলির আঘাত সহ্য করা ওটার পক্ষে সম্ভব হত না। জানি না মূর্তিটা কী দিয়ে তৈরি।

গৌতম খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মূর্তিটার দিকে। একটা চিমটে দিয়ে কুড়িয়ে নিতে লাগল মূর্তিটার চারিপাশে পড়ে থাকা লতাপাতা। যদি এর থেকে কোনো ক্লু পাওয়া যায়। মানে সাপে না কামড়িয়েও সাপের বিষের প্রভাব কীভাবে মানুষের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে এটা জানার ইচ্ছেই আমাদের এই বিপদসংকুল পথে টেনে এনেছে।

গৌতম বেশ মন দিয়ে কাজ করছিল। হঠাৎই কোথা থেকে একটা তির এসে ওর হাতে লাগল। ও যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। লরেন্স সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলটা আনসেফ পোজিশনে নিয়ে চলে এল। ও গুলি করতেই যাচ্ছিল। ডুমা ওকে থামিয়ে দিয়ে কীসব যেন বলল।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন বিকট দর্শন পুরুষ মানুষ। ওরা দীর্ঘদেহী, ওদের সারা শরীরে নানা রঙের আলপনা।

ডুমা ওদের সাথে অন্য একটা ভাষায় কথা বলল। একজন দীর্ঘদেহী লোক এগিয়ে এসে বেশ মেজাজ নিয়েই কিছু একটা বলল। লোকটার হাতে একটা লাঠি ধরা যে লাঠিটা একটু অন্যরকমের। দুটো সাপ জড়াজড়ি করে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে, দেখে তাই মনে হচ্ছে।

ডুমা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "সাহেব ফিরে চলুন। ওরা আপনাদের উপস্থিতি পছন্দ করছে না। ওদের ধারণা ওদের দেবী এতে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। আমি ওদের বললাম, আপনারা মানুষের রোগ সারান। কিন্তু ওরা ওদের ওঝাকে যতটা বিশ্বাস করে আপনাদের তার একচুলও করল বলে মনে হল না। শুধুশুধু বিবাদ না বাড়িয়ে ফিরে যাওয়াই উচিত।"

হতাশ হয়ে আমরা ফেরার রাস্তা ধরলাম। কিছুই আর করার নেই। আমাদের গবেষণা সম্পূর্ণ হল না এটাই আক্ষেপ থেকে গেল। রাতে তাঁবু খাটানো হল। সেই রাতেই গৌতমের এল প্রবল জ্বর। আমাদের কাছে যে ওষুধ ছিল তা দিয়ে জ্বর



নামতে চাইল না। খাওয়ার জলটুকু বাদে আশেপাশে জলের আর তেমন কোনো সোর্স নেই। কাজেই সেটা রোগীর মাথায় দিলে আমাদেরও জলের অভাবেই মরতে হবে।

অনেক রাতে জেগে গেল গৌতম। ওর সারা শরীর তখন ঘেমে স্নান করে গেছে। ও হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম জানেন! ওই দেবী আমাকে ডাকছেন। আমার রক্তের স্বাদ ওঁর ভালো লেগেছে। ওই দেবী আমাকে ডাকছেন।"

গৌতমের মাথায় হাত রেখে দেখলাম জ্বর নেই। এবং ওকে যেন অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে।

১৪/১০/১৯৫৩

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম গৌতম আমাদের মাঝে নেই। চারিদিকে খোঁজা হল ওকে। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। ডুমা একটা লম্বা গাছের মাথায় উঠে অনেক দূর অবধি দেখার চেষ্টা করল। কাউকে দেখতে না পেয়ে সে নেমে এল। ওই গাছের মাথা থেকে নাকি পাঁচ কিলোমিটার দূর অবধি দেখা যায়। জঙ্গল সেখানে ততটা ঘন ছিল না। কাজেই চিন্তায় পড়া গেল। ছেলেটা কি ভোজবাজির মতো উবে গেল!

কাল শেষ রাতে ওর বলা কথাটা মনে পড়ল। দেবী ওকে ডাকছেন! আমি আর লরেন্স ডুমাকে রাজি করালাম আবার ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে। প্রথমটায় ও আপত্তি করছিল, কিন্তু একটু পরেই রাজি হয়ে গেল। কী যেন ভাবল মনে মনে। ওকে অবশ্য ওই দেবীর ডাকের কথাটা বলা হয়নি।

সন্ধের মুখে আমরা যখন মূর্তিটার কাছাকাছি চলে এসেছি তখন আমি ডুমাকে বললাম কথাটা। যে আমার বন্ধুটি স্বপ্নে দেখেছে ওই দেবীমূর্তি ওকে ডাকছে। কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠল ডুমা। যেন কোনো অনর্থ হয়ে গেছে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে আমরা যেন এসে পড়েছি, ওর চোখের ভাষা দেখে তাই মনে হল।

ডুমা চিৎকার করে উঠল, "এবার সব শেষ হয়ে যাবে সাহেব, সব শেষ হয়ে যাবে। যে পুরুষ দেবীর ডাক শুনতে পায় তাকে দেবীর পছন্দ হয়। দেবী তখন তার শরীরটা ভোগ করতে চান। তার পর সেই লোক ধীরে ধীরে পঙ্গু হয়ে মারা যায়। আর এই যে আমরা এখানে এসে পড়েছি, আমাদেরও ক্ষতি হয়ে

যাবে। আমাদের পরিবারের মেয়েরা বিবাহ কিম্বা যৌনতার ছোঁয়া পেলেই ধীরে ধীরে ওই দেবীর মতোই হয়ে ওঠে। আর তার পরেই তার হাতে আয়ু থাকে মাত্র একমাস। যদি ওই পুরুষের বংশধর এসে তাকে রক্ষা করে যে দেবীর ডাক শুনেছিল তাহলেই একমাত্র প্রাণে বাঁচতে পারে মেয়েটি। না হলে কালসর্পের গ্রাস থেকে কারও মুক্তি নেই। কোনো মেয়ে সর্পদেবীর মতো হয়ে উঠলেই আবার মহামারির প্রকোপ দেখা দেয়।”

ডুমার কথায় কান না দিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম মূর্তিটার দিকে। সামনের দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। গৌতমের গায়ে জামাকাপড় নেই। সে অচৈতন্য অবস্থায় জড়িয়ে আছে মূর্তিটাকে। তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচছে কিউকু প্রজাতির লোকেরা।

“হাবুল, তুই এত রাতে এখানে কী করছিস?”

বাবার গলা পেয়ে খাতাটা বন্ধ করে দিল হাবুল। ওর কপাল জুড়ে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম। বীরেশ্বর নিয়োগী সরু চোখে তাকালেন ছেলের দিকে। খাতাটা ততক্ষণে হাবুল লুকিয়ে ফেলেছে।

“অশৌচের বাড়িতে এই রাতবিরেতে একা ছাদে বসে থাকবি না।” গম্ভীর গলায় বললেন বীরেশ্বর।

হাবুলের বলতে ইচ্ছে করছিল সে তো ছাদে নেই, রয়েছে ছাদের ঘরে। কিন্তু কোনো কথা না বলে গুটি গুটি পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল।

১০

গৌরবের মন বলছে ওর স্ত্রীয়ের মধ্যে কোনো গভীর মানসিক সমস্যা আছে। না হলে ও কাল সঙ্গমের সময় অমন সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরছিল কেন গৌরবকে! আর সেই সমস্যা কোনো সাধারণ মনোরোগ নয়। সেই রোগ অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে। ডাক্তার দেবল ভট্টাচার্যের চেম্বারের বাইরে বসে আছে ও। নিজের পরিচয় দিলে হয়তো রিসেপশনের বসে থাকা সুন্দরী তরুণীটি ওকে আগে ছেড়ে দিত, কিন্তু ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে একজন সাধারণ পেশেন্টের মতোই ডাক্তার ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলবে।

"স্যার, আপনি ভেতরে যান।"

তরুণীটির গলার স্বরে ভাবনায় ছেদ পড়ল গৌরবের। তার পর বেশ অপ্রস্তুতভাবে ও বলল, "আমাকে কিছু বললেন?"

"হ্যাঁ স্যার, আপনি এবার ভেতরে যেতে পারেন।"

গৌরব ডাক্তার ভট্টাচার্যের চেম্বারের দরজায় হালকা টোকা দিল। ভেতর থেকে গলার স্বর ভেসে এল, "কাম ইন!"

ডাক্তার দেবল ভট্টাচার্য গৌরবকে দেখে বেশ চমকে উঠলেন। বললেন, "এ কি, তুমি!"

"হ্যাঁ স্যার!"

"তুমি এসেছ সেটা আগে বললেই তো..."

ডাক্তার ভট্টাচার্যকে থামিয়ে দিয়ে গৌরব বলল, "মানে, স্যার... আমি বাইরে বলতে চাইনি। আমি একজন সাধারণ পেশেন্টের মতোই আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি। তাই..."

ডাক্তার ভট্টাচার্যের ভ্রুটা কিছুটা কুঁচকে গেল। একটু সময় নিয়ে তিনি গৌরবকে ভালো করে দেখলেন। তার পর বললেন, "টেক ইওর সিট্। বলো তোমার কী সমস্যা হচ্ছে?"

নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে শান্ত হয়ে বসল গৌরব। ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "বেশিদিন হয়নি আমার বিয়ে হয়েছে। একেবারে হঠাৎ করেই বিয়েটা হয়ে গেল। অচেনা অজানা একটা মেয়েকে স্ত্রীয়ের মর্যাদা দিয়ে ফেললাম মাত্র পাঁচ মিনিটে নেওয়া সিদ্ধান্তে। আমার এক বন্ধুর কথায় আমি না করতে পারলাম না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আরও একটু সময় নেওয়া উচিত ছিল। মেয়েটার সঙ্গে অন্তত আলাপ পরিচয় করে নেবার দরকার ছিল। গতকাল একটা ঘটনা ঘটেছে, যার পর থেকে মনে হচ্ছে মেয়েটা মানসিকভাবে সুস্থ নয় এবং সে আমাকে হ্যালুসিনেট করাচ্ছে। যেমন সে নিজেও হ্যালুসিনেট করে, ঠিক সেইভাবেই।"

তারচেয়েও অনভিপ্রেত ঘটনা হল, কেন কাল গৌরব অমন করল। মেয়েটাকে অমন করে ভালোবাসাহীন কাম পাগলের মতো কেন আঁকড়ে ধরল ও। বারবার এই কথাটাই মাথার মধ্যে পাক খেয়ে চলেছে। তবে এসব বলার সময় এখনো আসেনি। ডাক্তার দেবল ভট্টাচার্য প্রশ্ন না করলে ও বলতেও চায় না।

"যেমন?" জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার ভট্টাচার্য।

“আমরা যেদিন প্রথম আমাদের ফ্ল্যাটে এলাম, সেদিনেরই কথা, ও বলল, মানে আমার স্ত্রী বলল, সে নাকি কাউকে দেখতে পাচ্ছে পাখার সাথে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলা অবস্থায়। ওর ভয় করছিল। আমাকে শুতে যেতে বলল। ওর আচরণ কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের। কথা বলেই না প্রায়। সারাক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে। আমার মনে হচ্ছে ওর এই আচরণগুলো আমার মধ্যে প্রভাব ফেলছে। কাল আমিও একটা জিনিস দেখে বেশ বিস্মিত হয়েছি। অন্ধকারের মধ্যে রূপাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে আমার স্ত্রী নয়। অন্য কেউ যেন! ভয়ংকর দেখাচ্ছিল ওকে। হঠাৎ ও সরীসৃপদের মতো বুকে ভর দিয়ে চলছিল ফ্লোরের ওপর। পরক্ষণেই দেখলাম, আসলে এতক্ষণ যা দেখেছি সব ভুল। রূপা আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল।”

গৌরবের কথা মন দিয়ে শুনছিলেন ডাক্তার ভট্টাচার্য। কিছু একটা ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, “আচ্ছা তোমাদের মধ্যে এই ক’দিনে কেমন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে? আই মিন্...”

গৌরব কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। ওদের সম্পর্কের রসায়ন এখনও বেশ শীতল শুধু কাল ঘটে যাওয়া ওই শারিরীক মিলনের ঘটনাটুকু বাদে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিয়ের পরে যেমন সম্পর্ক গড়ে ওঠে তেমন সম্পর্ক এখনো গড়ে ওঠেনি। পারস্পরিক বোঝাপড়ার জায়গাতেও ব্যাপারটা আছে কি! মনে করার চেষ্টা করেও কোথাও যেন সব জট পাকিয়ে গেল গৌরবের। কাল রূপার জায়গায় যে মেয়েটিকে ও নিজের ঘরে দেখেছে তার মাথার চুলগুলো যেমন জট পাকানো ছিল, মনে হল মানসিক ধোঁয়াশার জট তার চেয়েও প্রগাঢ়।

“মানসিক সম্পর্ক তেমনভাবে জমাট বাঁধেনি আমাদের মধ্যে। দুটো মন এখনো যেন পাশাপাশি থেকেও অনেক দূরে আছে। ওই যে বলছি, আমাদের মধ্যে কথাই হয় না প্রায়। ওর আচরণ কেমন যেন সবকিছুকে শান্ত আর নির্জীব করে রেখেছে। শুধু কাল ওকে আমি শরীরের ভীষণ তাড়নায় ভোগ করেছি। তারপর থেকেই আমার মধ্যে একটা পাপবোধ কাজ করছে। আমি যেন তখন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। ও যেন আমাকে রসাতলে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল। শারীরিক মিলনের সময় ওকে মনে হচ্ছিল ও যেন ঠিক ওই কম কথা বলা শান্ত মেয়েটি নয়।” সাহস সঞ্চয় করে উত্তর দিল গৌরব।

দেবল ভট্টাচার্য একটা ওষুধ লিখলেন প্রেসক্রিপশন প্যাডের পাতায়। তারপর শান্ত স্বরে বললেন, “আমি একবার তোমার স্ত্রীয়ের সাথে একটা সিটিং

করতে চাইছি। মনে হচ্ছে তোমার মধ্যে তেমন কোনো সমস্যা নেই। শ্রবণেন্দ্রিয় তোমায় একটা মেসেজ পাঠিয়েছে, যেটা তোমার মস্তিষ্ক ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। তোমার স্ত্রীয়ের থেকে শোনা কথায় তোমার মধ্যে এক ধরনের হ্যালুসিনেশন হয়েছে। ঠিক যেমন বাচ্চাদের মধ্যে হয়। বাচ্চাদের তুমি একটা গল্প বলবে বা ধরো কিছু নিয়ে ভয় দেখাবে। এই যেমন ধরো কোনো বাচ্চাকে বললে, ওই গাছের দিকে তাকাস না, ওখানে ভূত আছে। বাচ্চাটা ভয়ে ভয়ে সেদিকে চাইল আর বলতে শুরু করল, সে সেই গাছে কাউকে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে দেখছে। অডিটরি হ্যালুসিনেশন! আর শারীরিক ব্যাপারটা নিয়ে পাপবোধের কিছু নেই। সম্ভোগের সময় প্রত্যেকের আচরণ আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। খুব শিক্ষিত এবং শান্ত মানুষের যৌন প্রবৃত্তিও একটু জটিল হতে পারে।”

প্রেসক্রিপশনটা হাতে নিল গৌরব। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ডাক্তার ভট্টাচার্যের দিকে। দেবল ভট্টাচার্য হেসে বললেন, “চিন্তা কোরো না, খুবই মাইল্ড ডোজের একটা ওষুধ লিখেছি তোমায়। সাতটা দিন খেলেই আশা করি তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার স্ত্রীয়ের সাথে না বসলে বুঝতে পারব না ওর সমস্যাটা আসলে কোথায়!”

১১

“বারো রাশিতে বারো ধরনের কালসর্প যোগের কথা জ্যোতিষশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তোমার ভাসুরঝির অষ্টমে রাহু আর দ্বিতীয়াতে কেতু। এই যোগ ভালো নয়। এই জন্মছকে কোনো গ্রহই তেমন বলবান নয় যে ওই রাহু কেতুর কুপ্রভাব থেকে তোমাদের বাড়ির মেয়েকে রক্ষা করতে পারে। এই কালসর্প দোষকে বলা হয় কারকোত্বক কালসর্প দোষ! এর প্রভাব মোটেই শুভ নয়। অপমৃত্যু নির্দেশ করে এই যোগ।”

সেই সুদূর মেমারি থেকে নিয়তি নিয়োগী আজ ছুটে এসেছেন কলকাতায়। মারা যাওয়ার সময় তাঁর খুড়শ্বশুর যা বলে গেছেন তা প্রতিনিয়ত ভাবিয়ে মারছে তাঁকে। এই নব্বই বছরের বৃদ্ধের প্রতি তাঁদের পরিবারের অগাধ আস্থা আছে আজও। ভদ্রলোকের কথা কখনো মেলেনি এমন হয়নি। ভাসুর আর জা-কে চিন্তিত দেখে নিয়তি আর থাকতে পারেননি। রূপা ওঁরও খুব আপন। ছেলেবেলা থেকে

কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন তিনি মেয়েটাকে। হাবুল তো অনেক দেরিতে জন্মেছে। একটা সমস্যা ছিল নিয়তির, ডাক্তারবাবুরা বলেই দিয়েছিলেন তিনি কখনো মা হতে পারবেন না। কিন্তু এই বৃদ্ধ মানুষটা একমাত্র ভরসা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "চিন্তা কোরো না মা। তোমার ঘর আলো করে ছেলে আসবে। সেই ছেলে এমন কিছু করবে যার জন্য সকলেই তাকে মনে রাখবে।" তারপরেও কেটে গেছিল চারটে বছর এবং একদিন সত্যিই ফলেছিল কথাটা।

"জ্যাঠাবাবু!"

নিয়তির ডাকে নুয়ে পড়া ঘাড়টা সোজা করার চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ হরিনারায়ণ শাস্ত্রী। ছানি পড়া ঘোলাটে চোখে তাকালেন একবার নিয়তির দিকে। তখনই কাশির একটা দমক উঠল ওঁর। বেশ কিছুক্ষণ কেশে নিয়ে তিনি বললেন, "এই মেয়ের কি ছেলেবেলায় কোনো কঠিন অসুখ করেছিল? এই যেমন ধর টাইফয়েড বা তেমন কোনো জ্বর?"

নিয়তি বৃদ্ধ হরিনারায়ণের কথা অবাক হলেন না। তিনি জানেন এই জ্যোতিষী ভদ্রলোকের কিছু অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। অনেক দূর দেখতে পান তিনি। নিয়তি মৃদু গলায় বললেন, "হ্যাঁ জ্যাঠাবাবু, ওর যখন এগারো বছর বয়স তখন একবার কঠিন জ্বর হয়। টাইফয়েড! বর্ধমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওকে। আমরা রূপার বাঁচার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ করেই একদিন সুস্থ হয়ে উঠল রূপা! ওর চামড়া উঠতে শুরু করেছিল। একজন ডাক্তারবাবু বলেছিলেন সেটা নাকি স্বাভাবিক টাইফয়েডের ক্ষেত্রে। চামড়া ওঠা বা চুল ওঠা, এই ধরনের উপসর্গ অনেকের মধ্যে দেখা যায়। ওকে কেমন যেন বর্ণহীন দেখাত সেই সময়ে। তার পরে আস্তে আস্তে আবার ফিরে এসেছিল জৌলুস। মেয়েটা একেবারে সেরে উঠেছিল। কিন্তু কী জানেন জ্যাঠাবাবু! ও আর আগের মতো ছিল না। পড়াশোনা থেকে মন উঠে গেছিল। নিজের মনে একা একা থাকতে শুরু করেছিল। আমার ছেলে হাবুলকে ও খুব ভালোবাসত, রোগের পর থেকে কেমন যেন দূরে দূরে থাকতে শুরু করেছিল ভাইয়ের থেকে। ছাদে আপন মনে ঘুরে বেড়াত আর কী যেন বিড়বিড় করত মনে মনে। আমার খুড়শ্বশুর একমাত্র মেয়েটাকে চোখে চোখে রাখতেন। তার কয়েকদিন পরেই উনি সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হন।"

হরিনারায়ণ শাস্ত্রী কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন জানলার বাইরে। সকালের রোদ এসে পড়ছে বাইরে থেকে। সেই রোদে

মিশে আছে হাজার হাজার ধূলিকণা। একটা কাগজ টেনে নিলেন শাস্ত্রীমশাই। তার পরে সেই কাগজের ওপর কীসব আঁকিবুঁকি কেটে বললেন, "আচ্ছা মা, তোমার ভাসুরঝি যখন বাড়ি ফিরে এল রোগমুক্ত হয়ে তারপর কি চেনা পরিচিত কেউ মারা গেছিল তোমাদের বাড়িতে, ধরো খুব ভয়ংকরভাবে?"

এবার একটু স্তম্ভিত হলেন নিয়তি। একটু আমতা আমতা করে বললেন, "চরণ!"

"এই চরণ নামের লোকটা কে মা?" প্রশ্ন করলেন হরিনারায়ণ শাস্ত্রী।

"চরণ ছিল আমার ছোট শ্বশুরমশাইয়ের মালি। যেদিন রূপার প্রথম জ্বর আসে সেদিন চরণকে আমার খুড়শ্বশুর খুব মেরেছিলেন। কেন মেরেছিলেন তা আমরা জানি না। পরের দিন থেকে আমরা আর চরণকে আমাদের বাড়ির আশেপাশে খুঁজে পাইনি। শ্বশুরমশাই শুধু আমার স্বামীকে বলেছিলেন চরণ নাকি জানোয়ার হয়ে গেছে, নেশা করলে সে কী যে করে সে নিজেও জানে না। রূপা যেদিন বাড়ি ফিরল, তার ঠিক তিনদিন পরেই আমাদের পুকুরের পাড়ে চরণের মৃতদেহ পাওয়া গেল। সারা শরীর নীল হয়ে গেছিল। ডাক্তার এসে দেখে বলেছিলেন সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে ওর। ভারী আশ্চর্যের বিষয় হল, সেই সময়টা ছিল শীতকাল। সাপের কামড়ে শীতে কেউ মারা যায় বলে শুনিনি। এক যদি সাপ যে গর্তে ঘুমিয়ে থাকে সেই গর্তে কেউ পা না ফেলে। আমাদের পুকুর বা বাগানের আশেপাশে কোথাও কোনো সাপের বাস ছিল না। বাস্তুসাপ ছিল দুটো, কিন্তু ওরা কখনো কারও ক্ষতি করেছে বলে শুনিনি।"

এক নিঃশ্বাসে অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁফিয়ে উঠলেন নিয়তি। বুড়ো হরিনারায়ণ ওঁর দিকে চেয়ে কিছু একটা ভাবলেন। তারপর বললেন, "এই মেয়েটার ভাগ্য বড় খারাপ গো মা। এমনিতেই মেয়েটা কালসর্প দোষ নিয়ে জন্মেছিল। শুধু সেই দোষটুকু থাকলেও নয় বাঁচানো যেত। কিন্তু সমস্যা কী জানো!"

নিয়তি চিন্তিত গলায় প্রশ্ন করলেন, "কী জ্যাঠাবাবু?"

"সমস্যা হল, ও নিজেই সাপের সঙ্গে সহবাস করছে। ওর মধ্যেই আছে একটা বিষধর কালো সাপ। ও ওই এগারো বছর বয়সে এমন কিছু একটা স্পর্শ করেছিল যেটার অভিসম্পাত ওর মধ্যে প্রবেশ করে। আর এর কিছুদিনের মাথাতেই ও শিকার হয় কোনো লোভাতুর মানুষের লালসার। যে মানুষটা ওকে জোর করে ভোগ করার চেষ্টা করে। আর সেই বোধ ওকে জাগিয়ে তোলে। ওর

ভেতর এমন কিছু রয়েছে যে সঙ্গমে তৃপ্ত হয়ে নিজের শক্তি ফিরে পেয়েছে। এমন অনেক অপদেবতা বা অপদেবীর কথা বলা আছে দেশ-বিদেশের লোককথায়। তেমনই কোনো অপদেবী বাস করছে মেয়েটার ভেতর। ওই মালিটার মৃত্যুর পরে সেই দেবীর প্রভাব কমে এসেছিল ওর ওপর থেকে। কিন্তু এতগুলো বছর পরে আবার যখন ওর বিয়ে হল, ও কোনো পুরুষের স্পর্শ পেল, ওর সুপ্ত ইচ্ছেই যেন অভিশাপ হয়ে ফিরে এসেছে। সত্যিই জানি না মা, আমি সত্যিই জানি না, তোমার ভাসুরঝিকে আর বাঁচানো যাবে কিনা। তবুও জগদীশ্বরী যদি চান, তাঁর ইচ্ছেতেই এই জগৎ চলে, তিনিই বাঁচাবেন। আমি শুধু চেষ্টা করতে পারি। তুমি এখন যাও মা, অনেকটা পথ ফিরতে হবে।”

নিয়তি উঠে দাঁড়ালেন। সেই মুহূর্তেই ওঁর ফোনটা বেজে উঠল। বীরেশ্বর ফোন করেছেন। তিনি বেশ হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, “হাবুলকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। মোড়ের চায়ের দোকানের জিতু ওকে বর্ধমান যাওয়ার বাস ধরতে দেখেছে।”

হয়রান হয়ে ছুটে বেরিয়ে আসছিলেন নিয়তি হরিনারায়ণের ঘর থেকে। তাঁর এই ক্ষ্যাপা ছেলেটাকে নিয়ে হয়েছে মহা বিপদ! পেছন থেকে হরিনারায়ণের গলার স্বর শোনা গেল, “চিন্তা কোরো না মা। ছেলে গেছে মা কামাক্ষ্যার দোরে। সে ব্যাটা সমাধান না নিয়ে ফিরবে না।”

১২

দেবেশ নিয়োগীর দেরাজ থেকে বাধ্য হয়েই হাবুল দু হাজার টাকা চুরি করেছে। ছোড়দাদুর খাতায় এমন কিছু পেয়েছে ও, যে আর ঘরে থাকতে মন চায়নি। দিদিকে যেভাবেই হোক সুস্থ করে তুলতে হবে। হাতে বেশি সময় নেই। আর মাত্র সাতদিনের মধ্যেই নিজের বিষ উগড়ে দিয়ে মারা যাবে দিদি! এমনটাও কি হওয়া সম্ভব! এই চিন্তাটাই বারবার ফিরে ফিরে আসছে হাবুলের মনে।

স্লিপার ক্লাসের একটা সাইড লোয়ার বার্থের টিকিট পেয়ে গেছে হাবুল। সঙ্গে স্টুডেন্ট কার্ডটা ছিল বলেই কিছুটা সাহায্য হয়েছে। ওর খুব খিদে পেয়েছিল। কিন্তু এখন ওসবে পাত্তা দিলে চলবে না। খাতাটায় আবার মননিবেশ করল ও।

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ

সে রাতে আমরা গৌতমকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলাম। আমাদের বাধা দিয়েছিল কিউকু আদিবাসীরা। কিছুতেই সেই মূর্তির কাছাকাছি যেতে দিচ্ছিল না ওরা। ডুমা চিৎকার করছিল, "শাপ লাগবে স্যার... শাপ লাগবে... দেবী মামি ওয়াটার শাপে আপনার বংশের মেয়েরা জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে... দেবী এখন আপনার বন্ধুর সাথে সঙ্গম করছেন... ফিরে চলুন স্যার..."

আমি পেশায় ডাক্তার। এইসব উদ্ভট কথাবার্তা আমার পেশাকে অপমান করে। তাছাড়া সহকর্মীকে এভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে আমি ফিরে আসতে পারতাম না। আফ্রিকার উপজাতিরা বর্বর প্রকৃতির হয়। এই কিউকুরা ওদের নাচের শেষে যে আমার সহকর্মীটির মাথা কেটে দেবীর পায়ে নৈবেদ্য দেবে না তার কী গ্যারান্টি! অগত্যা আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম অচৈতন্য গৌতমকে উদ্ধার করতে। লরেন্সের বন্দুক গর্জে উঠল পরপর তিনবার। ভয় পেয়ে সরে গেল কিউকুরা। একেবারে কাছে গিয়ে লক্ষ করলাম, কিউকু দীর্ঘদেহী লোকটার হাতে যে লাঠিটা আগের দিন ধরা ছিল সেটা মূর্তিটার হাতে রয়েছে। কী মনে হতেই ওই শঙ্খ লাগা সাপের আকারের লাঠিটা দেবীমূর্তির হাত থেকে খুলে নিলাম আমি। আর সাথে সাথেই জ্ঞান ফিরে এল গৌতমের। নিজের অবস্থা দেখে সে প্রথমটায় কিছুটা লজ্জা পেলেও মূর্তির মুখের দিকে তাকিয়ে আবার কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেল। একটা চাদর দিয়ে আমি ওর সারা শরীরটা ঢেকে দিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে ওকে তুলে আনলাম মূর্তিটার ওপর থেকে। তার পর ফেরার পথ নিলাম। কিছুটা দৌড়েই বিপদসীমা পার করলাম আমরা। লরেন্সের হাতে তখনও ধরা আছে বন্দুকটা। মাঝে মাঝেই ও শূন্যে গুলি ছুড়ছিল।

যখন আমরা টেন্টের একেবারে কাছে চলে এসেছি, ডুমা বলল, "সাহেব ওই লাঠিটা ফেলে দিন। আর এই সাহেবকেও বেশিদিন বাঁচাতে পারবেন না। ওঁর মায়া ভুলতে থাকুন। এই যে এত কষ্ট করে ওঁকে বাঁচিয়ে আনলেন এতে কিন্তু কোনো লাভ হল না।"

ডাক্তার হাসান এগিয়ে এসেছিল। ডুমার কথা শুনে ওর মাথাটা গরম হয়ে গেল। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে একটা চড় মেরে দিল ডাক্তার হাসান ডুমার গালে। লোকটা কিছুই বলল না। শুধু ফিরে যেতে যেতে আক্ষেপ করতে করতে বলতে লাগল, "বেইমানের জাতেরা কেউ বাঁচবে না। মরবে, এক এক করে সব মরবে।

যে অভিশাপ নিজেরাই ডেকে এনেছে তার থেকে কারও মুক্তি নেই।”

নভেম্বর দ্বিতীয় সপ্তাহ

আর এখানে থাকার কোনো মানে নেই। এবার ঘরে ফিরতে হবে। রোগের প্রকোপ হঠাৎ করেই কমতে শুরু করেছে। তবে এই সপ্তাহের শুরুতেই ঘটে গেছে দুটো খারাপ ঘটনা। ডাক্তার হাসান নিহত হয়েছেন। হাসপাতালে একদল কিউকু প্রজাতির মানুষ ঢুকে ওঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে চলে গেছে। এতে বোধহয় ওদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়বে বই কমবে না। সাহেবরা হার স্বীকার করতে চায় না। বিশেষ করে এই অসভ্য উপজাতিদের কাছে তো নয়ই। আমাদের স্বাধীনতা অনেক কষ্টের ফসল। জানি এই অসভ্য জঙ্গুলে মানুষগুলোও একদিন স্বাধীন হবে। অনেক রক্তপাতের বিনিময় তা আসবে। সেদিক থেকে কিউকুদের প্রতি একটা হালকা সমর্থন থাকলেও হাসানের মৃত্যুটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

দ্বিতীয় খারাপ ঘটনাটা হল, ডাক্তার লরেন্সের দুর্ঘটনা। সন্ধের দিকে কেন যে তিনি হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে জঙ্গলের পথে গেছিলেন এটা এখনও রহস্যই থেকে গেছে আমাদের কাছে। ডাক্তারের মাথায় একটা ভারী এবং মোটা গাছের ডাল পড়েছে। এতে তিনি কোমায় চলে গেছেন। আইরিশ ডাক্তার জেকব বলেছেন লরেন্সের ব্রেইন ডেড হয়ে গেছে। কতক্ষণ তিনি বেঁচে থাকবেন সেটা বলা যাচ্ছে না। তিনি একপ্রকার মারাই গেছেন। কেবল হৃৎপিণ্ডটা চলছে।

গৌতমের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। সে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। খাওয়াদাওয়াও করছে যৎসামান্য। আমাকে ওকে সাথে নিয়েই ফিরতে হবে।

প্রথম খাতাটা এখানেই শেষ হয়েছে। কয়েক পাতা কেবল ডায়রি লেখার মতো খাপছাড়া লেখা। তার পরেই পাতার পর পাতা ফাঁকা।

এবার হাবুল খুলে ফেলল ছোড়দাদুর দ্বিতীয় খাতাটা। এই খাতায় দিন তারিখ বা মাসের কোনো বালাই নেই। খাতার প্রথম কয়েকটা পাতা ফাঁকা। কুড়ি বাইশ পাতার পরে একটা ছবি আঁকা। ছবির নিচে যিনি এঁকেছেন তিনি সই করেছেন। দেখে যা মনে হচ্ছে একটা সাদা পাতায় কেউ ছবিটা এঁকেছেন আর ছোড়দাদু সেই ছবিটা নিজের খাতায় আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছেন। ঠিক তার

পরের পাতা থেকে লেখা শুরু হয়েছে—

কিউকুদের ওই শঙ্খলাগা সর্পদণ্ডটা তুলে আনা মোটেই ঠিক হয়নি। ওই লাঠিটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক ক্ষমতা আছে। না হলে ওটাকে বহুবার আমি অন্য জায়গায় ফেলে এসেছি। আবার ফিরে এসেছে আমার কাছে। এমন কী করে হল বুঝতে পারছি না। আমি কি তবে স্বপ্নের মধ্যে ওই লাঠিটা ফেলে আসি নানা জায়গায়! এই প্রশ্নটা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

হাবুল দেখল এর পরে অনেকগুলো পাতা আবার ফাঁকা। সেই পাতাগুলোয় নানারকমের আঁকিবুঁকি কাটা রয়েছে। যার মর্মোদ্ধার করা হাবুলের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি ভয় পাচ্ছি। আমার ছোট বোনের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে বিয়ের পরে। ওকে অবিকল সেই মূর্তির দেবীর মতো দেখতে হয়ে যাচ্ছে। কাল দাদার নির্দেশে ওকে দেখতে গিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। দাদা বলেছিলেন বিয়ের পরে নাকি ওর যত্ন হচ্ছে না শ্বশুর বাড়িতে। স্বামীটা নাকি লম্পট। অন্য কোনো মেয়ের সাথে তার আশনাই আছে। অথচ গিয়ে দেখলাম সব ভুল। এই কথা বাড়ি ফিরে বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। আমার বোনের শ্বশুরমশাই কঠিন অসুখে পড়েছেন। কেনিয়াতে আমি যে রোগের চিকিৎসা করতে গেছিলাম ওঁর রোগের লক্ষণগুলোও ঠিক তেমন। একজন ডাক্তার হিসেবে আমি ওঁকে পরীক্ষা করে যা বুঝলাম, উনি আর বেশিক্ষণ আমাদের মাঝে থাকবেন না। আমি ওই বাড়ি থেকে বেরিয়েই আসছিলাম, তখনই বাড়ির এক পরিচারিকা আমায় ডেকে বলল, আমার বোনের স্বামী ভয়ে পালিয়ে গেছে। অন্যান্য সকলেই ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছে। ওদের মনে হয় আমার বোনের মধ্যে কোনো প্রেতাত্মার ভর আছে! একজন ডাক্তার হিসেবে এসব মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ওসব কথায় কান না দিয়েই বেরিয়ে এসেছিলাম ওই বাড়ি থেকে।

আবার দুটো পাতা ফাঁকা রেখে দেওয়া হয়েছে খাতার। তিন নম্বর পাতায় লেখা রয়েছে, বোন আর বেঁচে নেই! খবর এসেছে অভাগীটা জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। বিয়ের দিন সকালে ও আমার ঘরে ঢুকেছিল। আমার ভয় করছে, আমার মনে হচ্ছে ও ওই দণ্ডটার স্পর্শ পেয়েছে। ডুমার কথা শোনা উচিত ছিল। ওর কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। অভিশাপ লেগেছে আমার বাড়িতে। তাও আবার আমার কারণে। এ কথা কাউকে বলা যাবে না। লুকিয়ে ফেলতে হবে ওই

শঙ্খলাগা সর্পদণ্ড।

খাতায় এই অবধি লেখার পরের অনেকগুলো পাতায় কিছুই লেখা নেই। সাদা পাতাগুলো কালের নিয়মে কেমন রঙ বদলে ফেলেছে। যে পাতাগুলোয় লেখা হয়েছিল সেগুলো বিবর্ণ হয়েছে বটে, তবে সাদা পাতাগুলোর এই রঙের পরিবর্তন বেশ চোখে লাগছে হাবুলের।

অচেনা একটা লোক এসে হাবুলকে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছ ভাই? স্কুলের এক্সকারসন নাকি?"

হাবুল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। অচেনা অজানা কাউকে নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়াটা বোকামি হয়ে যাবে। তাছাড়া পথে ও বিপদেও পড়তে পারে। লোকটা আবার অতি উৎসাহ দেখিয়ে বলল, "কই তোমার কোনো বন্ধুবান্ধবকে তো দেখছি না, শিক্ষকমশাইরাই বা গেলেন কোথায়?"

হাবুল ওর বাবা এবং মা দু'জনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই পেয়েছে। কখনো কখনো ও বাবার মতো রাগী এবং অহংকারী মনোভাব প্রকাশ করে ফেলে আবার কখনো মায়ের মত নরম আর আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে ও বাবার মতোই ব্যবহার করল লোকটার সঙ্গে। ও বেশ ঝাঁঝের সাথে উত্তর দিল, "নিজের চরকাটা কি বাড়িতে রেখে এসেছেন? সাথে নিয়ে আসলে লাগেজ বাড়ত ঠিকই কিন্তু অন্যের চরকা ধরে টানাটানি করতেন না তেল দেওয়ার জন্য।"

লোকটার মুখ দেখে মনে হল সে বেশ অপমানিত হয়েছে। সে নিজের জায়গায় গিয়ে মাথা নিচু করে বসে একটা পত্রিকা পড়তে লাগল।

হাবুল আবার মন দিল খাতার পাতায়। এবার যে পাতাটা ও খুঁজে পেল সেই পাতাটা ওকে বেশ আগ্রহী করে তুলল। সেই পাতায় লেখা আছে–

ডাক্তার গৌতম সেন আবার চেম্বার করছে। ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। এই এত বছর পরে ওকে দেখে মনটা আনন্দে ভরে উঠল। তবে গৌতমের পায়ে কোনো সমস্যা হয়েছে বোধহয়। ও কেমন যেন একটা পা টেনে হাঁটছে দেখলাম লাঠিতে ভর দিয়ে। ও আমাকে ওর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাল।

গৌতমের বাড়িটা বেশ ছিমছাম। ওর স্ত্রী আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি রাখল না। বারবার আমাকে বলতে লাগল আজ আমি না থাকলে ওরা সব হারাত। গৌতমের একটা ফুটফুটে ছেলে হয়েছে। অনেক আশীর্বাদ করে এলাম ছেলেটাকে। ফেরার সময় গৌতম আমার হাত ধরে বলল, "নিয়োগীদা আমি আর

এখানে থাকব না। ছোটনাগপুরের দিকে চলে যাচ্ছি। ওখানেই প্র্যাক্টিস করব এখন থেকে।” আমি একটু যেন অবাকই হলাম ওর কথা শুনে। বললাম, “এখানে তো ভালোই জমিয়ে ফেলেছ হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছ কেন?” কী যেন ভাবল ও মনে মনে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাতে যেন জমা হয়েছে এক পৃথিবী রহস্য। গৌতম আস্তে আস্তে ফিসফিসিয়ে বলল, “দেবীর সাথে সঙ্গম হয়েছে আমার। এই দেখুন না, পঙ্গু হয়ে যাচ্ছি ধীরে ধীরে। তবে মুক্তির একটা রাস্তা পেয়েছি। কামাক্ষ্যার এক সাধক এই সবকিছু থেকে মুক্তি দিতে পারেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে তারপরেই যাব ছোটনাগপুরে। আর আপনি যদি পারেন তো ওই সর্পদণ্ডটা ফেলে দিন। অথবা লুকিয়ে ফেলুন এমন কোনো জায়গায় যেন ওটা কোনো মহিলার সংস্পর্শে না আসে।”

আমার বোনের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা গৌতমকে বললাম। শোনার পরে ওর মধ্যে বিশেষ হেলদোল দেখা গেল না। বরং ওকে দেখে মনে হল এটাই যেন হওয়ার ছিল। ও শুধু বলল, “বড় কোনো বিপদ বা মহামারি লাগেনি তাই রক্ষে। হয়তো আপনাদের কোনো পূর্বপুরুষের অনেক পুণ্যের ফলে আপনাদের পরিবারটা বেঁচে গেছে!”

মাসখানেক পরে আমি একদিন একজন পেশেন্টের খবরাখবর নিতে সল্টলেকের দিকে গেছিলাম। কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ায় মনে হল একবার গৌতমদের দেখে যাই। আমার অ্যাম্বাসেডর গাড়িটা ওর বাড়ির দরজার সামনে দাঁড় করালাম। পাঁচ ফুট উচ্চতার শৌখিন লোহার দরজাটার দিকে চেয়ে রীতিমতো অবাক হতে হল আমাকে। কারণ সেই দরজাটার বাইরে ঝুলছিল একটা শক্তিশালী তালা। আর তারচেয়েও যে জিনিসটা আরও অবাক করেছিল আমাকে সেটা হল, বাড়ির ঠিক বাইরে দেয়ালের গায়ে একটা কাগজ সাঁটা ছিল, যাতে লেখা ছিল– বাড়িটি বিক্রি হতে চলেছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ যেন নারায়ণ বিল্ডার্সের অমুক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেন!

অনেক খোঁজ করেছিলাম গৌতমের। এমনকি ছোটনাগপুরে অবধি চলে গেছিলাম। সেখানে মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার্সদের একটা ক্লাব মতো ছিল। সপ্তাহ শেষে ডাক্তারবাবুরা সেই ক্লাবে আসতেন, শরীরচর্চা করতেন। সেই জায়গায় গিয়েও খোঁজ নিয়েছিলাম আমি। কলকাতা থেকে আসা গৌতম সেন নামের কোনো ডাক্তারের নামই যেন ওরা শোনেননি, তেমনই বলেছিলেন ওঁরা। মালভূমির

এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে থাকা কিছু গ্রামে তখন হৃদয়বান কিছু ডাক্তার বিনে পয়সায় চিকিৎসা করত। ওঁদের কাছেও গেছিলাম আমি। কিন্তু ফিরতে হয়েছিল শূন্য হাতে। মানুষ নিজে থেকে হারিয়ে যেতে চাইলে কোনোভাবেই হয়তো তাদের ফেরানো যায় না। ভারাক্রান্ত মনে ফিরেছিলাম কলকাতা। সেখান থেকে গৌতমের এক সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করে যেদিন বাড়ি ফিরলাম মেমারিতে তখনও আমি জানতাম না আমার জন্য কী অপেক্ষা করে আছে।

শরীরের ক্লান্তি পুকুরের জলে ধুয়ে সবে সন্ধের মুখে চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বসেছি। হঠাৎ ভোলা দৌড়ে এসে বলল, আমার সাথে কেউ দেখা করতে এসেছে। লোকটার খুব কষ্ট হচ্ছে। ক্র্যাচে ভর দিয়ে সে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। আমার কী যেন মনে হল, আমি ভোলার পেছন পেছন ছুটে গিয়ে দেখলাম যা আন্দাজ করেছিলাম তাই ঠিক। সারা শরীর চাদরে মোড়া, তবুও বুঝতে অসুবিধা হয় না ওটা যে গৌতম!

ভোলা চলে যেতেই খুব কষ্ট করে গৌতম আমার সামনে একটা চেয়ারে বসল। ওর মুখের ওপর থেকে চাদরের আড়াল সরাতেই আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম। সেই লাল লাল র‍্যাশগুলোয় ভরে রয়েছে ওর মুখ। সেই মুখ চেনা যায় না।

"কী হয়েছে তোমার?" জিজ্ঞেস করলাম গৌতমকে।

গৌতম হাঁফাতে হাঁফাতে উত্তর দিল, "সে অনেক কথা নিয়োগীদা। আমার হাতে অত সময় নেই। জানি না আমার অবর্তমানে আমার বউ, বাচ্চার কী হবে। আমার চিকিৎসার পেছনেই সব টাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে মৃত্যু কামনা করছি, কিন্তু মৃত্যুও আমাকে স্পর্শ করতে ঘেন্না পাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে পালিয়ে যাব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই বোঝার দায় আপনার কাছে উজার করে দিলেই আমি শান্তিতে মারা যেতে পারব। স্ত্রী-পুত্রের সাথে শেষ সময়টুকু কাটিয়ে যেতে পারব।"

"কীসের বোঝার দায়?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম'আমি।

গৌতম আবার হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "আমার শরীরের নিচের দিকটায় আর কোনো সাড় নেই। এই যে বসে আছি, সেটা কিন্তু অনুভব করতে পারছি না। ডুমার কথাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। মামি ওয়াটার লোককথা মিথ্যে নয়। আমার আর ছোটনাগপুর যাওয়া হয়নি..."

গৌতমকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, "সে কথা আমি জানি। তোমার খোঁজে আমি সে অঞ্চলে এতদিন পাগলের মতো ঘুরেছি।"

গৌতম বলল, "আমাকে ক্ষমা করবেন নিয়োগীদা। আপনি আমায় কতটা ভালোবাসেন তা আমি জানি। যাইহোক, শুনুন মন দিয়ে। আমি তিনমাস আগে হাঁটুর দিক থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সাড় হারিয়েছি। তখনই বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছি আপনজনেদের কাছে। তিনমাস আগে অবধি আমি কাটিয়েছি সর্পতান্ত্রিকদের সঙ্গে। আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের বসবাস। তাদের জীবনও ভীষণ রহস্যময়। শঙ্খচূড়ের মতো ভয়ানক সাপকে তারা বশ মানায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি এসব। তাদের ওঠাবসা সাপ নিয়েই। সাপের বিষ এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার হাজার কৌশল তাদের জানা। সাধারণ বেদে জাতির সঙ্গে এদের গুলিয়ে ফেলা ভুল হবে। এরা অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা লাভ করেছে দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম ও সাধনার গুণে। একমাত্র এই সর্পতান্ত্রিকেরাই পারে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে। আমার মৃত্যুর পরে হয়তো আমার পরিবারের ওপর থেকে মামি ওয়াটার কালো ছায়া সরে যাবে, কিন্তু মনে করে দেখুন ডুমা আপনাকে সাবধান করেছিল, আপনি সেই সাবধান বাণী অগ্রাহ্য করে আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে গেছিলেন যার ফল ভোগ করছে আপনার বাড়ির মেয়েরা। আপনার বোনের ওপর তো মামি ওয়াটার কালো দৃষ্টির প্রভাবই পড়েছিল! ঠিক না? বহু কষ্টে আজ আপনার কাছে আসতে পেরেছি। জানি না আবার দেখা হবে কিনা! তাই এই আমার দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমের ফসল আর এই মামি ওয়াটার ছবিটা আপনাকে দিয়ে গেলাম। এই পাতাগুলোর মর্মোদ্ধার করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, এতে লেখা আছে সাপের বিষের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং সর্পতন্ত্রের নানা বিধি। আপনি এমন কিছু দিয়ে এগুলি কোথাও লিখে রাখবেন যা খালি চোখে না দেখা যায়। এই বিধির মাধ্যমে মানুষের মঙ্গল যেমন করা সম্ভব তেমনই হাজার খারাপ এবং জঘন্য কাজও করা যায়। একই সাথে একবেলার মধ্যে বিষের প্রভাবে মেরে ফেলা যায় লাখ লাখ মানুষ। এগুলো নিন, আমার যাওয়ার সময় হয়েছে।"

গৌতম কথা শেষ করেই অনেক কষ্টে ক্র্যাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে গেল আমাদের বাড়ি থেকে। আমি অনেক ডাকলাম ওকে পেছন থেকে, সাড়া পেলাম না। যেন নিমেষের মধ্যে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ও। আমি এবং ভোলা সন্ধ্যের অন্ধকারে বাইরে বেরিয়ে ওকে আর খুঁজে পেলাম না।

খাতার অনেকগুলো পাতা আবার ফাঁকা রয়েছে। হাবুল কিছুটা উৎসাহ হারিয়ে ফেলল যেন মনে মনে। ওর এবার অন্যরকম একটা চিন্তা কাজ করছে। সর্পতান্ত্রিকদের বসবাস আসামে, শুধু এটুকু ওই খাতার ওই পাতাটায় আগে একবার চোখ বোলানোর সঙ্গে সঙ্গেই মনের জোর নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ির বাইরে। এখন এই নিরুৎসাহের কারণ হল ওই বিধির ব্যাপারটা না বুঝতে পারা। কারণ খাতাটার আরও কয়েকটা পাতা ঘেঁটেও কোনো বিধি বা তন্ত্রমন্ত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। শেষের দিকে আরও চারপাতা মতো লেখা আছে কিন্তু সেখানে আবার বর্ণনা আর নিজের কথা ছাড়া আর কিছু নেই।

"হাবুল!" কারও হাতের স্পর্শ কাঁধে এসে লাগল হাবুলের। গলার স্বরটাও বেশ চেনা। ও খাতার পাতাগুলোর মধ্যে এমনভাবেই হারিয়ে গেছিল যে, ট্রেনে ওর চারপাশে কী হচ্ছে কিছুই খেয়াল ছিল না।

মাথা উঁচু করে তাকিয়ে হাবুল চমকে গেল। ইনি তো মামা! দিদির অলোক মামা। মানুষটা ভবঘুরে ধরনের। ওঁকে দেখে চমকে সরে গেল হাবুল। বলে উঠল, "আমি বাড়ি যাব না... দিদিকে আমাকে বাঁচাতেই হবে... প্লিজ মামা আমি বাড়ি ফিরে যাব না..."

বিয়ের পরের দিন সকালেই অলোক সামন্ত আবার তল্পিতল্পা নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিলেন। তিনি কিছুই জানেন না কোথায় কী ঘটে গেছে। তাঁকে একটু চিন্তিতই দেখাল এবার। এই তো ভাগ্নির বিয়ে হল, এরই মধ্যে কী ঘটে গেল!

"কী হয়েছে হাবুল?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

হাবুল কয়েকটা ঢোঁক গিলে বলল, "ছোড়দাদু মারা গেছেন, উনি মারা যাওয়ার সময়ে বলে গেছেন দিদি আর বেশিদিন বাঁচবে না। কালসর্পের শাপ নাকি আবার ফিরে এসেছে..."

অলোক সামন্ত হাবুলের মাথায় সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, "কত কী ঘটে গেল অথচ কিছুই জানি না। তোমার দিদি কি সত্যিই অসুস্থ?"

হাবুল দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "তা আমি জানি না।"

হাসলেন অলোক সামন্ত, "তুমি একজন মৃত্যুপথযাত্রীর কথা শুনে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ দিদিকে বাঁচানোর জন্য। ওদিকে তুমি জানোই না দিদি ভালো আছে না খারাপ আছে! ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো! তুমি না বিজ্ঞান পড়ো। লজিক নেই এমন জিনিস তুমি মেনে নাও কীভাবে?"

"দাদুও বিজ্ঞানের সেবক ছিলেন। তিনি ডাক্তার ছিলেন। তিনি যদি মেনে নেন, আমি কেন মেনে নিতে পারব না!" হাবুল খাতাদুটো বের করে এগিয়ে দিল অলোক সামন্তের দিকে। বলল, "এগুলো পড়ে দেখুন, তারপরে নয় বিচার করবেন আমি পালিয়ে এসে ঠিক করেছি না ভুল!"

অলোক সামন্ত পাতার পর পাতা পড়তে লাগলেন দ্রুত। তাঁর কাছেও বিষয়টা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কখন যে প্রথম খাতাটা শেষ হয়ে গেল তিনি নিজেই টের পেলেন না। সেটা বন্ধ করে রেখে তিনি বললেন, "হাবুল তুমি কিছু খেয়েছ?"

মাথা নাড়ল হাবুল। খাতাগুলো পড়ার আগ্রহে খিদে তৃষ্ণা সব ভুলে গেছিল সে। অলোক সামন্ত বললেন, "আমার সঙ্গে আমার কম্পার্টমেন্টে চলো, কোনো অসুবিধা হবে না। একসাথে খাওয়াদাওয়া করে তারপর অন্য খাতাটা পড়া যাবে।"

১৩

ডাক্তার দেবল ভট্টাচার্য রূপাকে দেখার পর নিজেই কিছুটা দ্বন্দ্বে পড়ে গেছেন। কখনো মনে হচ্ছে মেয়েটা একেবারেই সুস্থ আবার কখনো মনে হচ্ছে অ্যাকিউট সাইকোলজিকাল ডিসোর্ডার আছে মেয়েটার মধ্যে। এম আর আই রিপোর্টে একটা অ্যাবনরমাল জিনিস লক্ষ করেছেন ডাক্তার। সেটাই বারবার ভাবাচ্ছে ওঁকে।

আরও কয়েকটা সিটিং চললে পাওয়া যাবে মেয়েটার ভেতরের অন্ধকারের হদিশ। রিপোর্টগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ ভীষণ শরীর খারাপ লাগল ডাক্তার ভট্টাচার্যর। মাথাটা ঘুরতে লাগল। মনে হল এক্ষুনি সব বমি হয়ে বেরিয়ে আসবে পেটের ভেতর যা কিছু আছে। আর তখনই তাঁর চোখ পড়ল এম আর আই প্লেটটার একটা বিশেষ জায়গায়। কিছু নিউরো ট্রান্সমিটারের চলাচল ভীষণ অদ্ভুত। মানুষের দেহে এমনটা তিনি আগে হতে দেখেননি। দ্রুত গৌরবের নম্বরে ফোন করলেন তিনি। গৌরব ফোন ধরে হ্যালো... হ্যালো... করে চলল। কিন্তু ডাক্তার দেবল ভট্টাচার্য হাজার চেষ্টা করেও কথা বলতে পারলেন না। সারা শরীর জ্বলতে লাগল তাঁর। তিনি খেয়াল করলেন হাতের চেটোর ওপরে, কবজি থেকে কনুই অবধি বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট লাল লাল গুটি বেরোচ্ছে। জ্বলে যাচ্ছে সেই গুটিগুলোর চারিপাশ। ভয়ে আতঙ্কে তিনি চিৎকার করে উঠতে চাইলেন,

কিন্তু গলা দিয়ে সামান্য স্বরটুকুও বেরোল না।

* * * * * * * * *

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল হঠাৎ। এই বৃষ্টি এবার শীতটা বাড়িয়ে দেবে বেশ কয়েকগুণ। গৌরব চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল। ওর এবার বেশ শীত শীত লাগছে। আর কোনো পেশেন্ট নেই আপাতত। ওর মনে হল একবার ওয়ার্ডে টহল দিয়ে গেলে কেমন হয়! সকালে ডাক্তার ভট্টাচার্যের ক্লিনিক থেকে ফিরে আসার পর থেকে রূপার শরীরটাও ভালো নেই। আসার সময় গৌরব দেখে এসেছে মেয়েটার জ্বর এসেছে। বাড়ি ফিরে গেলেও হয়। এখন বয়স কম, তাই ডিউটির কথাটাই আগে মনে হল। এই ক'দিনে যাদের ও অপারেশন করেছে তাদের একবার দেখে গেলে মনের শান্তি। ঠিক তখনই বেজে উঠল ফোনটা। গৌরব পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখল ডাক্তার দেবল ভট্টাচার্যের নাম ভেসে উঠছে ডিসপ্লে স্ক্রিনে। ও ফোনটা ধরল বটে, কিন্তু অবাক হল ওদিকে থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে। হতেই পারে ভুল করে উনি গৌরবের নম্বরটা ডায়াল করে ফেলেছেন। ফোনটা একসময় নিজে থেকেই কেটে গেল। গৌরব পাল্টা কয়েকবার ডাক্তার ভট্টাচার্যকে ফোন করল, রিং হয়ে কেটে গেল।

একজন সিনিয়র ডাক্তার করিডোর ধরে এগিয়ে আসছিলেন। তিনি হাসিমুখে গৌরবকে জিজ্ঞেস করলেন, "রাউন্ডে বেরিয়েছেন? চলুন আমিও একবার ঘুরে আসি।"

পকেটে ফোনটা ঢুকিয়ে রাখল গৌরব, পরে আবার চেষ্টা করা যাবে! এয়ারকন্ডিশনের ভোঁতা হাওয়ায় ওয়ার্ডটা একেবারে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে রয়েছে। শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস এই যন্ত্রগুলোর কোনো বিরাম নেই। বাইরের আবহাওয়ার চেয়ে যদিও ভেতরের আবহাওয়া সামান্য উষ্ণ, এবং সেটা ওই যন্ত্রের কারণেই। ওয়ার্ডে ঢুকে ও দেখল অনেকেই তখন সন্ধেবেলার চায়ে চুমুক দিতে ব্যস্ত। ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুটে কামড় বসাচ্ছে বয়স্কদের ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত। তার শব্দ ভীষণ অদ্ভুত। শুনলে কেমন যেন গা শিরশির করে ওঠে।

রাখাল মণ্ডল নামের একজনের অপারেশন করেছিল গৌরব সপ্তাহ খানেক আগে। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। বয়স্ক মানুষটা ওকে দেখে হাসল। ও মৃদু

গলায় জিজ্ঞেস করল, "ভালো আছেন?" সে মাথা নাড়ল। সে ভালো আছে। রিপোর্টে একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে মেট্রনকে ডাকল গৌরব। বলল, "আমি ডিসচার্জ লিখে দিয়ে যাচ্ছি কাল আর এম ও এলে তাঁকে একবার দেখে নিয়ে ডিসচার্জ করে দিতে বলবেন। আর হ্যাঁ, ওষুধগুলোও একবার ভালো করে দেখে বুঝিয়ে দিতে বলবেন।" ভদ্রলোক আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলল গৌরবের উদ্দেশ্যে। ও হেসে কয়েকটা বেড পার করে অন্য একটা বেডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে একটা বাচ্চা ছেলে শুয়ে আছে, বয়েস এগারো কি বারো হবে! এমনিতে এই বয়সের পেশেন্টদের আলাদা ওয়ার্ড থাকে কিন্তু এই ছেলেটার ক্ষেত্রে একটু নিয়ম বদলানো হয়েছে। এতে সে মোটেই অখুশি হয়নি। বরং অন্যান্য বয়স্ক মানুষগুলোর সঙ্গে তার ভালোই ভাব জমে উঠেছে।

বাচ্চাটা গৌরবকে জিজ্ঞেস করল, "আমি বাড়ি কবে যাব ডক্টর আঙ্কেল?"

হাসল গৌরব। বলল, "কেন তোমায় এখানকার নার্স দিদিরা ভালো করে দেখছে না? যদি না দেখে তো আমাকে বলো আমি ওদের খুব করে বকে দিই।"

ছেলেটা বেশ পাকা পাকা গলায় বলল, "অল গুড। আমার কোনো কমপ্লেন নেই। বাড়িতে রিকি আর মিনু আছে, ওরা আমাকে না দেখে থাকতে পারে না, তাই জিজ্ঞেস করলাম বাড়ি কবে যাব?"

"রিকি আর মিনু, বাহ্ সুন্দর নাম তো! এরা কারা?"

"ওরা আমার বন্ধু। একটা হল জার্মান শেপার্ড ড্গ আর একটা এখানকার ক্যাট।"

গৌরব বাচ্চাটার কথা শুনে শব্দ করে হেসে উঠল। এখানকার ক্যাট! বেশ ভালো বলেছে তো ছেলেটা। জার্মানির কুকুরের সঙ্গে ভারতীয় বিড়ালের সহাবস্থান!

গৌরবকে হাসতে দেখে বাচ্চা ছেলেটা একটু আহত হল। মুখ গোমড়া করে কিছুক্ষণ বসে রইল। গৌরব পরিস্থিতির সামাল দিতে বলল, "আচ্ছা তুমি যদি এক্ষুনি রাগটা গপ করে গিলে ফেলো তবে আমি ফ্রাইডে আফটারনুনে তোমাকে বাড়ি ছেড়ে দেব। আই হোপ তোমার উন্ডটা ততদিনে শুকিয়ে যাবে।"

বাচ্চাটা নিমেষের মধ্যে মেজাজ বদলে ফেলল। সে হেসে উঠল। তার পরে বালিশের তলা থেকে একটা জেমসের প্যাকেট বের করে গৌরবের হাতে তুলে দিল।

"এটা আমার নাকি?"

উত্তর না দিয়ে ছেলেটা লাজুকভাবে হাসল।

আর দু'জন আছে। তাদের দেখে নিলেই আজকের মত ডিউটি শেষ। একজন পেশেন্ট এখনো ঘুমোচ্ছে। অ্যানাস্থেশিয়ার এফেক্ট এখনো কাটেনি। গৌরব নার্সকে ওষুধ বুঝিয়ে সেই বৃদ্ধার বেডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অপারেশনের পরে বৃদ্ধার চেহারা কেমন যেন পালটে গেছে। ওঁর ছেলে বলেছিল মায়ের কিছু হবে না। অপারেশন করার জন্য একপ্রকার জোরই করেছিল। সেদিন গৌরব অপারেশন করতে চায়নি। ও জানত মহিলার শরীরের যা অবস্থা, হয়তো অতটা ধকল সহ্য করতে পারবেন না। তাই-ই হয়েছে। অপারেশনের পরের দিন থেকেই মাঝে মাঝে জ্ঞান হারাচ্ছেন বৃদ্ধা।

একটা মনিটরে সারাক্ষণ হার্টরেট আর ব্লাড প্রেশার দেখিয়ে যাচ্ছে। গৌরব সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নার্সকে ডেকে বলল, "প্রেশার যে হারে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে মনে হয় না খুব বেশিদিন সারভাইভ করতে পারবে। ওঁর ছেলেকে ডেকে কাল একটু কথা বলতে হবে। আমি এগারোটা নাগাদ হাসপাতালে আসব, ছেলেটা এলে একবার আমার সাথে দেখা করতে বলবেন।"

গৌরবের কথা শুনে মাথা নাড়ল নার্স। গৌরবের কাজ মোটামুটি শেষ এবার বেরিয়ে পড়তে পারলেই হয়। ও বেশ খোশমেজাজে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আসতে গেল ঠিক তখনই দপ্ করে নিভে গেল ওয়ার্ডের আলো। এমনটা কখনো হয় না। গৌরব শুনতে পেল কেউ যেন ফিসফিস করে ওর পেছনে কোনো কথা বলছে। ও পেছন ফিরতেই আঁতকে উঠল। বুড়ি বেডটার ওপর পা সোজা করে বসে আছেন। সাদা চুলে তাঁর মুখটা ঢাকা পড়েছে। তার ফাঁক দিয়েই দেখা যাচ্ছে একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। সেই চোখ থেকে নীলাভ আলোর একটা ক্ষীণ দ্যুতি বেরিয়ে আসছে।

বিশ্রী ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বৃদ্ধা গৌরবকে ডাকলেন, "এদিকে আয় ডাক্তার!"

যন্ত্রচালিত পুতুলের মতোই গৌরব এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল বুড়ির দিকে। এই ডাক যেন অমান্য করা যায় না, কেউ কখনো সাড়া দেয়নি এমন হয়নি। ও গিয়ে দাঁড়াল বেডটার সামনে।

বৃদ্ধা বলে চলেছেন, "জানিস ডাক্তার! আমাদের বাড়িকে উত্তরবঙ্গে বলত ডাইনি বাড়ি। আমরা মানুষের গায়ের গন্ধ শুঁকে বলতে পারি তার জীবনে সুখের

দিন আসছে না আপদ বিপদ ধেয়ে আসছে। তোর গায়ে সেই কাল নাগিনীর গন্ধ প্রথম দিনই পেয়েছিলাম। এখন সে গন্ধ আরও কটু হয়ে উঠেছে।” খিক্ খিক্ করে পৈশাচিক হাসি হাসলেন বৃদ্ধা। তারপর রসিয়ে রসিয়ে বললেন, “সে তার মরদের দেহ পেয়েছে, আদর পেয়েছে, এখন সে ভয়ানক। এবার তার মানুষের প্রাণ চাই। ঠিক যেমন করে মহামারি লাগিয়ে দিয়ে সে অনেক মানুষ নিয়ে যায়, এবারেও তাই-ই করতে চায়। আমি থাকতে সে এই ঘরের ভেতরে ঢুকতে পারছে না। তুই আমাদের সঙ্গে সারাক্ষণ থাকিস, তাই আমাদের গন্ধই ওর নাকে গেছে। এবার ও বিষ ঢালবে। সবাই মরবে, কেউ বাঁচবে না। আমি যতক্ষণ পারব ঠেকিয়ে রাখব কিন্তু তারপরে কী হবে জানি না।”

গৌরবের সারা শরীর ঘেমে উঠতে লাগল। মাথা ঘুরতে লাগল। এই বুড়ির কথা ও কিছুই বুঝতে পারছে না। কার কথা বলছে বুড়ি! তাহলে কি... তাহলে কি...

“নাআআআআআআ...” গৌরব চেঁচিয়ে উঠল, আলোটাও দপ্ করে জ্বলে উঠল ওয়ার্ডের।

“কী হয়েছে স্যার?” প্রশ্নটা করে নার্স জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল গৌরবের দিকে।

“এই ভদ্রমহিলা কি উঠে বসেছিলেন এক্ষুনি?” পালটা প্রশ্ন করল গৌরব।

ভুরু কুঁচকে গেল নার্সের। সে বলল, “আলো চলে যাওয়ার পরে আমি এখানেই দাঁড়িয়েছিলাম। পাশের বিল্ডিংয়ের জোরালো আলোয় সামনের সবকিছুই দেখা যাচ্ছিল স্যার। আমি দেখলাম আপনি বেরিয়ে যেতে যেতেও অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার ওঁর বেডের কাছে ফিরে এলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই চিৎকার করে উঠলেন। উনি কিন্তু যেভাবে অচৈতন্য অবস্থায় শুয়েছিলেন এখনো তেমনই শুয়ে আছেন। মাঝেও ওভাবেই শুয়েছিলেন। কাজেই...”

নার্সের কথা সম্পূর্ণ না শুনেই ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল গৌরব। এখনি কি একবার ডাক্তার দেবল ভট্টাচার্যের চেম্বারে যাওয়া উচিত! মনে মনে ভাবল ও। ওষুধটা ঠিকঠাক কাজ করছে তো! যদিও মাত্র দু'দিন হয়েছে ওষুধটা খেয়েছে, তাও মনের মধ্যে চলে আসছে হাজার প্রশ্ন।

বাইরে এসে গৌরব দেখল বৃষ্টির বেগ আরও বেড়ে গেছে। আর আধঘন্টা এমনভাবে বৃষ্টি চলতে থাকলে জল দাঁড়িয়ে যাবে রাস্তায় রাস্তায়, তার চেয়ে বাড়ি

ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বাড়ি ফিরে ডাক্তার ভট্টাচার্যকে একটা ফোন করে কথা বলে নিলেই হবে।

ফ্ল্যাটের পার্কিংয়ে গাড়ি ঢোকাতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হল গৌরবকে। রাস্তাঘাট অন্ধকার হয়ে গেছে। কোথাও একটুও আলো জ্বলছে না। অথচ আসার সময়ে মনে হয়েছিল মেইন রোডের স্ট্রিট লাইটগুলো জ্বলছে। গৌরব হাঁক দিল, "সন্তোষদা... ও সন্তোষদা!"

অ্যাপার্টমেন্টের রাত্রিকালীন সিকিউরিটি গার্ড নিজের মোবাইলের টর্চটা জ্বালিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এল গৌরবের সামনে। মিহি গলায় সে প্রশ্ন করল, "ডাকছিলেন স্যার?"

গাড়ির দরজা বন্ধ করে গৌরব নেমে দাঁড়াল। পার্কিং লটে প্রবল বৃষ্টির ছাঁট আসছে। বিরক্তি লাগল গৌরবের। ভিজতে ভিজতেই ও জিজ্ঞেস করল, "লোডশেডিং হয়েছে নাকি?"

সন্তোষ উত্তর দিল, "না স্যার, বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গে মোড়ের ওদিকের ট্রান্সফর্মারটা জ্বলে গেছে, লোক এসেছে। জানি না ওদের কাজ কখন শেষ হবে। ওদিকে দেখুন না হঠাৎ কেমন যেন জ্বর জ্বর ভাব হচ্ছে। শইলডা কেমন যেন পাক মারছে। আপনি না ডাকলে বেঞ্চি ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। একবার ভাবলাম বাড়িই চলে যাই, চাকরি থাকে থাক না থাকে না থাক।"

গৌরবের মনে হঠাৎ যেন কেমন কু ডাক দিল। তিনতলার ওই মেয়েটার কথা মনে পড়ল। কাল ও খোঁজ নিয়েছে। মেয়েটার অবস্থা ভালো না। এখন নাকি খাওয়াদাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে! ও বলল, "কই দেখি কী হয়েছে তোমার?"

নিজের টর্চের আলোটা সন্তোষের দিকে ফেলতেই কয়েকটা হার্টবিট মিস হয়ে গেল যেন গৌরবের। সন্তোষের মধ্যেও রোগের প্রাথমিক উপসর্গ একই রকমের। গৌরব পেছন ফিরে দৌড়তে লাগল সিঁড়ির দিকে। আর বলতে লাগল, "তুমি এক্ষুনি আমাদের হাসপাতালে চলে যাও, ডাক্তার সত্য ঘোষাল বোধহয় এখনো ওখানেই আছেন। ওঁর সাথে গিয়ে দেখা করো। আমার মন বলছে এই বিল্ডিংয়ে মামি পক্সের সংক্রমণ হয়েছে। বাঁচতে চাইলে এখুনি যাও।" কথা শেষ করে ও ছুটল পাঁচতলার দিকে।

অন্ধকারে ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকে প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না গৌরব। একটা মোমবাতিও রূপা জ্বালেনি। অথচ মোমবাতি আছে এই ফ্ল্যাটে। গৌরব নিজে কিনে এনেছিল একসেট বড় মোমবাতি। সারা জীবন ও অন্ধকারেই মানুষ হয়েছে। পড়াশোনা করার সময় অনেকদিনই আলো চলে যেত। মা মোম এনে রাখতেন। সেই অভ্যাসটা আজও ওর মধ্যে রয়ে গেছে।

গৌরব ডাকল, "রূপা! এই রূপা!"

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। হঠাৎ কোনো দেওয়াল থেকে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল– চিক্ চিক্ চিক্ করে। চমকে উঠল গৌরব। ও আবার ডাকল, "এই রূপা!"

এবার শোনা গেল একটা অন্যরকমের শব্দ। এই শব্দ গৌরব ছোটবেলায় মামাবাড়ির বাগানে গরম আর বর্ষার দিনে অনেকবার শুনেছে। দিদিমা বলতেন, "চিন্তা কোরো না ভাই, ভয়ও কোরো না, ওরা মা মনসার স্যাঙাৎ! ওদেরও তো খিদে পায়, কী বলো! এখন ওরা ভেক আর ইঁদুর ধরে খাচ্ছে। তাই ওদের অমন তেজ বেড়েছে। কেমন ফোঁস ফোঁস করছে শুনেছ?" গৌরব ভয়ে ভয়ে আগেভাগে ঘুমিয়ে পড়ত আর কানের ওপর চাপা দিয়ে রাখত বালিশ, যাতে ওই শব্দ আর শুনতে না হয়।

আজ এতদিন পরেও গৌরবের সেই শব্দটা শুনে শরীর হিম হয়ে গেল। তাও মনের মধ্যে সাহস সঞ্চার করে এগিয়ে গেল শোয়ার ঘরের দিকে। ওর কেন জানি মনে হল শব্দটা সেদিক থেকেই আসছে! শোয়ার ঘরে ঢুকতেই বিপ্ বিপ্ শব্দ করে ফোনটা বন্ধ হয়ে গেল, ব্যাটারি চার্জ শেষ হয়েছে ওটার। গৌরব আবার ডাকল, "এই রূপা, তুমি কি এখানে আছ?"

আবার সাড়া পাওয়া গেল না। চারিদিক কালো গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে যেন। এবার খুব কাছ থেকেই শোনা যাচ্ছে– সস্... সস্... স্... সস্... শব্দটা।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠল। ঘরের ভেতরটা আলোয় ভরে উঠল নিমেষের মধ্যে। সামান্য সময়ের জন্য হলেও দেখতে পেল গৌরব, যে দৃশ্য দেখার জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। একটা কালো রঙের বিশাল চেহারার সাপ আর একটা সাপকে পেঁচিয়ে ধরে রয়েছে ওদের বেডরুমের বিছানার ওপর। ভয়ংকর প্রাণীদুটো

পাক খেতে খেতে স্থান বদলাচ্ছে। সে দৃশ্য জন্ম দেয় ভয়ের, অসীম অনাবিল ভয়ের।

মেডিকেলের ছাত্র হিসেবে গৌরবের ভয় অনেক কম। তাও সে সামনে দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না। জ্ঞান হারিয়ে গেল ওর। চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল কোনো এক রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছে ও। একজন মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ক্র্যাচে ভর দিয়ে। দারুণ সৌম্যকান্তি চেহারা তাঁর। তিনি যেন গৌরবকে বলছেন, "ওই মেয়েটাকে আরও কাছে টেনে নাও... একমাত্র আমাদেরই আছে সেই ক্ষমতা যারা সর্পদেবীর শাপ থেকে ওই বংশকে রক্ষা করতে পারে... ওকে ভালোবাসো, ওকে অনেক অনেক ভালবাসো, ঘৃণা কোরো না।"

গৌরব শুধু অস্ফুটে উচ্চারণ করল, "বাবা!" তারপর জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

১৫

দ্বিতীয় খাতায় মূর্তিটার ছবি দেখেই চমকে উঠলেন অলোক সামন্ত। মনে মনে তিনি বিড়বিড় করলেন, আরে এ তো সেই অ্যাফ্রো মেডুসা! জুলু আধিবাসীদের মধ্যে এঁকে নিয়ে প্রবল বিশ্বাস অবিশ্বাসের গাথা মুখে মুখে ফেরে। পাঁচ বছর আগে একটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ কোম্পানির একটা বিশেষ প্রজেক্টে তিনি আফ্রিকা গেছিলেন। তখনই মোম্বাসায় এক আফ্রিকান জুলু আদিবাসীর লোকের সঙ্গে দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল ওঁর। সে লোক ছিল অসীম সাহসী, তবে যুগের সাথে সাথে নিজেকে বদলে ফেলেছিল লোকটা। পড়াশোনা শিখে চাকরি করছিল জঙ্গুলে জীবন ছেড়ে। কাজ ফুরিয়ে এসেছিল তিনমাসের মাথায়, তখন সেই লোকটা ওঁকে বলেছিল, "আমার সাথে আফ্রিকা দেখবে সাহেব? মন ভরে যাবে তোমার।"

অলোক সামন্ত না করতে পারেননি। লোকটা সভ্যদের মাঝে এসে নিজের নাম বদলে দিয়েছিল। ওর নাম ছিল জনি। আসল নাম যে কী ছিল তা আজও জানেন না অলোক। একটা গাড়ি জোগাড় করে ওরা বেরিয়ে পড়েছিল। অলোক প্রকৃতির ওই সৌন্দর্য অবাক হয়ে দেখতেন। মাইলের পর মাইল হরিদ্রা বর্ণের বনভূমি! তাতে চড়ে বেড়াচ্ছে সাদায় কালোয় ডোরাকাটা জেব্রার দল। ওদের ভেতর কোনো ভয় নেই, কোনো সংকোচ নেই। সে এক অসাধারণ দৃশ্য। বিশাল

বিশাল বাওবাব গাছের আড়ালে কখন যে সূর্য ঢেকে যেত কারও খেয়ালই থাকত না। ভয় পেতেন অলোক, যদি সিংহ এসে হামলা করে। ম্যান ইটার্স অফ সাভো পড়ার পরে আফ্রিকার এই পশুরাজকে নিজে ভীতি নেই, এমন খুব কম বাঙালিকেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

জনি ওঁকে অভয় দিত। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলত, "দ্যে আর নট হার্মফুল... হোয়াইট হান্টার হান্টাস্ দ্যেম... আফতার দ্যাত দ্যে বিকেম ফ্রাইস... দ্যে কিল ওনলি হোয়াইট হান্টারস..."

জনি রাত হলেই একটা অদ্ভুত ঢোলের মতো জিনিস বাজিয়ে নিজের ভাষায় কীসব গান গাইত। শুনতে ভালো লাগল অলোকের।

একরাতে হল বিশাল বিপর্যয়। সেদিন তপ্ত সূর্যের তাপে পাগল পাগল দশা হয়েছিল দু'জনের। সাড়ে সাতটা বাজতে না বাজতেই রাতের খাবার খেয়ে ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল টেন্টে। রাত তখন কটা হবে অলোকের এখন আর মনে নেই। সিংহের ভয়ংকর গর্জনে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওঁর। তাঁবুর খুব কাছ থেকেই ডাকছিল একজোড়া সিংহ। টেন্টের জানালার ফাঁক থেকে ওদের দেখেছিলেন অলোক। একটা সিংহ আর একটা সিংহী বসেছিল দশ কি বারো মিটার দূরে। প্রবল রাগে গর্জন করছিল ওরা।

অলোক চিন্তান্বিত হয়ে জনিকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ওরা কি আমাদের মেরে ফেলবে?"

জনির মধ্যে তেমন কোনো ভাবান্তর লক্ষ করা যাচ্ছিল না। ও উত্তর দিয়েছিল, "আই গেস্ দ্য ফল্ট ইজ মাইন। আই ফরগট, দ্যাট সিজন ইজ দেয়ার মেটিং সিজন। দ্যে ডিজলাইক এনিথিং ডিসটার্বড দ্যেম।"

আধঘণ্টার মাথায় ঘটতে শুরু করেছিল আরও ভয়ংকর ঘটনা। সিংহটা অধৈর্যের মতো তাঁবুর বাইরের দেওয়ালে আঁচড় কাটতে শুরু করেছিল। আর প্রবল গর্জন করে চলেছিল। তখনই অলোক প্রথমবার জনির মুখে শুনেছিল নামটা– মামি ওয়াটা!

দশ মিনিটের মাথায় সিংহের তাণ্ডব থেমে গেছিল ভোজবাজির মতোই। অলোক জনিকে বলেছিলেন, "আমি শুনেছি এই ভূমি ব্ল্যাক মাজিক, মাম্বোজাম্বো, ভুডু, এসবের জন্য বিখ্যাত। তা তুমিও সেসব করলে নাকি, যে মহারাজ সস্ত্রীক পলায়ন করলেন?"

"নো ব্ল্যাক ম্যাজিক ফ্রেন্দ... নো ব্ল্যাক ম্যাজিক..." প্রতিবাদ করে উঠেছিল জনি। তারপর বুকে হাত ঠেকিয়ে অতি ভক্তি সহকারে বলেছিল, "মামি ওয়াটা ইজ আওয়ার গডেস অফ ওয়াটার। শি ফুলফিল আওয়ার নিড অফ থার্স্ট।"

সে রাতে ওইটুকুই কথা হয়েছিল অলোক আর জনির মধ্যে। দীর্ঘ সময় ধরে ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আবার পরের দিন সকাল থেকে শুরু হয়েছিল যাত্রা। জঙ্গুলে প্রকৃতি বারবার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল অলোকের। গলায় ঝোলানো শক্তিশালী লেন্সের ক্যামেরায় স্মৃতি ধরে রাখতে চাইছিলেন তিনি। তাই বারবার সেটা ঝলসে উঠছিল। জঙ্গলের গভীর থেকে আরও গভীরে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছিল জনি। একটা হাতির পাল শুধু কিছুক্ষণের জন্য গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ রাখতে বাধ্য করেছিল অ্যাফ্রো দুঃসাহসী ছেলেটাকে। তখনও সে ওই নামটাই বিড়বিড় করছিল। যেটা কানে গেছিল অলোকের।

"তুমি আমাকে মামি ওয়াটার কাহিনি বলো।" জানতে চেয়েছিলেন অলোক সামন্ত।

জনি যা বলেছিল তার বাংলা করলে এই দাঁড়ায়—

মামি ওয়াটা অনেক অনেক প্রাচীন এক দেবী। এই পূণ্য বনভূমির সাপেরা তার বশে থাকে। তার তেজ ব্ল্যাক মাম্বার চেয়েও ভয়াবহ। গতি চিতাবাঘের মতো। সে ভালোবাসে তার ভক্তদের। তার আশীর্বাদেই রুক্ষ জমিতে জল আসে। আবার তার অভিশাপে নেমে আসে মহামারি। যার প্রভাবে মারা যায় প্রচুর মানুষ। অনেকে তাকে ভোগবিলাসের দেবীও বলেছেন। বেশ্যাদের আলয়ে তার বসবাস। অসৎ পুরুষদের সে-ই নরকগামী করে। আর যে তাকে ভালোবেসে টেনে নেয় তার কাছে দেবী থেকে যায় চিরকাল।

কথা শেষ করে জনি বলল, "বন্ধু, কাল আমরা জঙ্গলের আরও ভেতরে যাব। আমি শুনেছি সেখানে নাকি অনেকদিনের পুরোনো মামি ওয়াটা দেবীর একটা মূর্তি আছে!"

মনে মনে প্রবল উৎসাহ বোধ করলেন অলোক সামন্ত। চাক্ষুষ যদি একবার দেবীমূর্তি দেখা যায় তাহলে তার অনুভুতিটাই আলাদা হবে। খুব ভোরে উঠে আবার গাড়ি স্টার্ট দিল জনি। বিকেলের দিকে গাড়িটা পৌঁছল একটা গভীর জঙ্গলের সামনে। এই জঙ্গলে বড় গাছের সঙ্গে সঙ্গে লতানে গাছের সংখ্যাও অনেক বেশি, গভীরে প্রবেশ করা একপ্রকার অস্বাভাবিক মনে হয় বাইরে থেকে

দেখলে। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল জনি, তারপর অলোককে নির্দেশ দিল তিনিও যেন নেমে যান। কারণ এর পরের রাস্তাটুকু আর গাড়ি প্রবেশ করতে পারবে না।

জঙ্গলটা শুরু হল ঘাসজমির মধ্যে দিয়ে। আস্তে আস্তে সেই ঘাস মানুষ সমান হয়ে উঠতে লাগল। তারপরেই ওরা দু'জন পা রাখল গভীর জঙ্গলের ভেতর। সেখানে যেন মানুষ চলার সামান্য রাস্তাটুকুও খুঁজে পাওয়া দায়। জনি বলল, "বন্ধু! আমরা যে জঙ্গল দিয়ে এখন চলেছি সেটা গাটামাইউ ফরেস্টের খুব গভীর একটা জায়গা। এখনও সাধারণ ট্যুরিস্টদের জন্য জায়গাটা আনএক্সপ্লোরড। এখানে রিভার গাটামাইউ বা সেই বিখ্যার ঝর্নাটা তুমি দেখতে পাবে না। ওদিকে আমরা কাজে যাব।"

মাঝারি উচ্চতার তাম্বোটি গাছের গা থেকে প্রচুর লতানে গাছ বেরিয়েছে আর সেগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে জঙ্গলের রাস্তা দুর্ভেদ্য করে তুলেছে। ফার্নের মতো পাতাওয়ালা কিছু গাছের অসংখ্য ঝোপে ঢাকা পড়েছে পথ। আদৌ ওগুলো ফার্ন কিনা তাও বুঝতে পারলেন না অলোক। সেই দুর্ভেদ্য পথেই এগিয়ে চলেছে জনি। ওর হাতে ধরা ম্যাশেটটা রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য বারে বারে নেমে আসছে লতা আর ডালপালাগুলোকে লক্ষ্য করে। তবুও যেন চলার পথ তৈরি হতে চাইছে না। এ জঙ্গল দেখেই মনে হয় দীর্ঘদিন এখানে কোনো মানুষ, এমনকি কোনো জন্তু-জানোয়ারের পায়ের ছাপও পড়েনি। উঁচু উঁচু গাছের ডালে নাম না জানা পাখি বসে আছে কয়েকটা, তারা ডাকাডাকি করছে না। জঙ্গলটাকে কেমন যেন বোবায় ধরেছে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পরে একটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল জনি। ও হাত তুলে সেদিকে যাওয়ার জন্য ইশারা করল। অলোক শুধু ওকে অনুসরণ করলেন মাত্র। জায়াগাটার গাছগুলো কেমন যেন অন্যরকম। গাছের পাতার রঙ কালো আর লম্বা। দেখে মনের মধ্যে একটা ভয়ের চোরা স্রোত এসে ধাক্কা মারে। পাতাগুলো যেন কেমন সাপের মতো দেখতে!

"বন্ধু, ওইদিকে দ্যাখো..."

জনির নির্দেশ মতো অলোক তাকালেন জঙ্গলের ডানদিকে। আর তাকাতেই ওঁর বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল। আফ্রিকান নারীদের মতো অবিকল এক নারীমূর্তি একটা গাছের তলায় বসে আছে। তার মাথাভর্তি জটাজুটো। দেখে মনে হতে পারে ওগুলো চুল নয়, সরু লিকলিকে চেহারার লক্ষ লক্ষ সাপ। ঠিক যেমন

মেডুসার মাথায় দেখা যায়! মূর্তিটা ভীষণ রকমের জীবন্ত বলে ভ্রম হবে। যেন কোনো মানবীই বসে আছে গাছের আড়ালে। তাকে জড়িয়ে উঠেছে দুটো ভয়ংকর দর্শন সাপ। তারচেয়েও অবাক করা ঘটনা হল, মূর্তিটার সারা শরীরে রয়েছে অসংখ্য বুলেটের ক্ষত চিহ্ন!

'মামি ওয়াটা!' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল জনি।

অলোক ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা তুলতেই ওঁকে বাধা দিল জনি। বলল, "কোনো প্রমাণ সাথে রেখো না বন্ধু। ইভেন নট অ্যা ফোটোগ্রাফ! আমি আগে বলেছিলাম, এই দেবী যেমন রক্ষা করেন তেমন আবার ধ্বংসও করেন। এমনকি আমরা এর আগে আর এগোবও না। মূর্তিটার কাছাকাছি যাওয়া মানেই ইদার তার ব্লেসিংস পাব নয়তো কার্স। সুতরাং ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। মামি ওয়াটার মূর্তি আমাদের দেখা হয়ে গেছে এবার ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

অলোক সামন্তরা সেদিন ফিরে এসেছিলেন জঙ্গলটার ভেতর থেকে। এরপরেও একমাস তিনি আফ্রিকায় ছিলেন। মাঝে মাঝেই রাতের বেলায় দেবীর ওই বীভৎস মুখটা স্বপ্নের মধ্যে ফিরে ফিরে আসত তখন। দেবীর শরীরে বুলেটের ক্ষত কেন ছিল সেটা অবশ্য জনি ওঁকে বলেনি। এই খাতাটা না পড়লে হয়ত ওঁর কাছে ব্যাপারটা সারাজীবন রহস্যই থেকে যেত! তারপরে অন্য দেশে অন্য কোনো কাজের মধ্যে গিয়ে আস্তে আস্তে সব ভুলে গেছিলেন তিনি। আজ এতদিন পরে খাতাটা সেই স্মৃতির ধুলো ঝেড়ে বের করে আনল সেই জঙ্গলের অধ্যায়টা।

কথায় কথায় একদিন জনিকে অলোক জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমরা যদি বুঝতে পারো যে মামি ওয়াটার অভিশাপ তোমাদের উপর নেমে এসেছে, তখন তোমরা কী করো?"

জনি উত্তর দিয়েছিল, "আমি জানি না বন্ধু, তবে আমার মায়ের মুখ থেকে শুনেছি একবার এক ট্রাইবালদের ওপর দেবীর অভিশাপ নেমে এসেছিল। তখন একজন মেডিসিন ম্যানকে ডেকে আনা হয়। তিনি একটা ফাঁদ পেতে বেশ কিছু সাপ ধরেন। সাপগুলোর ওপর দিনের পর দিন অত্যাচার করতে শুরু করেন। তিনি জানতেন গ্রামের কোনো না কোনো মহিলাকে দেবী ভর করেছেন। মহামারিতে বেশ কিছু মানুষের প্রাণ নিয়ে ওই মহিলাকে শেষ করে দেবী একদিন ফিরে যাবেন। কিন্তু সমস্যার ব্যাপার হয়েছিল কে যে সেই মহিলা তা বোঝা যাচ্ছিল না। মেডিসিন ম্যান সাপগুলোর ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে ছিলেন।

দেবী তাঁর সর্পসন্তানদের অত্যাচার সহ্য করতে পারেন না। এর দু'দিনের মাথায় সেই মহিলা নিজে থেকে এসে সেই ওঝা বা মেডিসিন ম্যানের ওপর চড়াও হয়। হাওয়ায় কিছু একটা ভাসিয়ে দেয় ওঝাটা। তার গন্ধে অবশ হয়ে যায় মহিলা। এরপর তাকে বেঁধে ফেলা হয়। তার জ্ঞান ফিরলে ওঝা তার কাছে জানতে চায়, মানুষের প্রাণ ছাড়া এমন কী জিনিস যা পেলে দেবী তাঁর অভিশাপ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাবেন? মহিলা ছ-ছ'টা কালো মোরগ দাবী করে। আমার মা নিজের চোখে দেখেছিল ওই মহিলাকে মোরগগুলোকে কাঁচা চিবিয়ে খেতে। তার ক্ষুধা মিটতেই সব শান্ত হয়ে যায় ধীরে ধীরে। সেই ওঝার যথেষ্ট বয়েস হয়েছিল, তিনি যাওয়ার সময় বলেছিলেন, দ্যাখো বাপু আমার বয়েস হয়েছে বিস্তর, ভবিষ্যতে যদি আবার দেবীর শাপ ফিরে আসে কোনো কারণে তখন সাপ যে প্রাণীদের ভয় পায় তাদের সাথে ছেড়ে দেবে যাকে দেবী ভর করেছে সেই মানুষকে। তবে আর কখনো দেবীর কোপে আমাদের পড়তে হয়নি। আমাদের গ্রামে আর কখনো মহামারি দেখা দেয়নি।"

অলোক একের পর এক পাতা পড়তে লাগলেন খাতাটার। বুঝতে পারলেন ত্রিলোকেশ্বর নিয়োগীর কারণে যে একদিন ওই শাপ তাঁর দিদির বাড়িতেও ফিরে এসেছে সে কথা। তবে মুক্তির একটা ক্ষীণ আশা দেখতে পাচ্ছেন তিনি। যদি সেই লোকের বংশধরকে খুঁজে পাওয়া যায় যে লোক নিজে থেকে দেবীকে গ্রহণ করেছিলেন! প্রথম খাতায় সেই ডুমা নামের লোকটার কথার ইঙ্গিত তেমনই ছিল। আর দ্বিতীয় একটা দিকও আছে, সেটা হল জনির সেই ম্যাজিক ম্যানের কথা অনুযায়ী সেই ভরপড়া ব্যক্তিকে সাপ যাদের ভয় পায় এমন প্রাণীদের সঙ্গে রাখা। তবে তাতে বেশ কিছুটা ঝুঁকি আছে!

খাতার শেষের দিকে পাতাগুলোয় পৌঁছলেন অলোক সামন্ত। তাতে লেখা আছে, হায় ঈশ্বর সেই অভিশাপ কখনো কি যাবে না আমাকে ছেড়ে! দেবেশের একটা ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে হয়েছে। যদি সেই অভিশাপ ওর ওপরেও আকাশের বজ্রের মতো নেমে আসে!

এর কয়েক পাতা পরে লেখা, দেবেশের মেয়েটা বড় হচ্ছে। এখন চারিদিকে চিল শকুন এসে বসবে। তাদের হাত থেকে ওকে রক্ষা করা আমার কাজ।

আবার এক জায়গায় লেখা হয়েছে, আমার বাগানের মালি চরণ শেষ অবধি কাজটা করল। এতে অবশ্য ওর দোষ নেই। দেবীর আকর্ষণ কেউ এড়িয়ে যেতে

পারে না। দেবী নিজেই বোধহয় ওর শরীরটা চেয়েছিলেন। তবে সমাজের চোখে একটা জঘন্য অপরাধ ও করেছে। ওকে আজ মেরে বের করে দিতে হয়েছে। অপরাধের শাস্তি হওয়া উচিত। তবে এরচেয়েও বড় শাস্তি ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

আজ চরণের মৃতদেহটা পাওয়া গেছে। বিষে বিষে নীল হয়ে গেছিল দেহটা। অথচ ময়না তদন্তে যে কোনো সাপের কামড়ের প্রমাণ পাওয়া যাবে না তা আমি জানি! শাস্তি পেয়েই গেল ছেলেটা। দেবী যাকে ভোগ করেন হয় তার মৃত্যু হয় নয় সে পঙ্গু হয়ে যায়।

খাতার শেষের পাতাটা লেখা হয়েছে বছর সাতেক আগে। অলোক সামন্ত মনে করে দেখার চেষ্টা করলেন তাঁর জামাইবাবুর কাকার কতবছর আগে সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছিল। হ্যাঁ, অঙ্কটা মিলে যাচ্ছে। সাত বছর আগেই উনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তার কয়েকদিন আগেই খাতা শেষ পাতাটা লেখা হয়েছে।

খাতায় লেখা আছে—

দেবেশের মেয়ে এখন সম্পূর্ণভাবে দেবীর অধিকারে। বিশ্বাসদের বাড়ির কুকুরটা একদিন ওকে দেখে খুব চিৎকার করছিল, দিন তিনেক পরে কুকুরটা মারা যায়। কুকুরটার সারা গায়ে ঘা হয়ে গেছিল। এখন একজন সর্পতান্ত্রিককে খুঁজে বের করতে না পারলে সব এলোমেলো হয়ে যাবে। মেয়েটার বিয়ের বয়েস হবে ধীরে ধীরে। জানি ওর কারও সাথেই বিয়ে হবে না। হয় সম্বন্ধ কেটে যাবে, নয়তো বিয়ের আসরে পৌঁছানোর আগেই দুর্ঘটনায় মারা যাবে বর। একমাত্র তার সাথেই ওর বিয়ে হতে পারে যাকে দেবী নির্বাচন করবেন। গৌতমের বলে যাওয়া বিধিগুলো আমি আমার দ্বিতীয় খাতায় লিখে রেখে গেলাম। বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই সেই লেখা উদ্ধার করতে পারবে। আজকাল বাগানে দেবীর ছায়ারা ঘুরে বেড়ায়। এই বয়সে এসে ওদের ওই বীভৎস রূপ আমি সহ্য করতে পারি না। জানি না কতদিন আমাকে বাঁচতে হবে। তবে এটুকু জানি আমার মৃত্যুর পরে ওই সর্পদণ্ডটা নিজের শক্তি হারাবে।

এই পর্যন্ত লেখার পরে আর কিছু লেখেননি ত্রিলোকেশ্বর নিয়োগী। অলোক সামন্ত খাতাটা বন্ধ করে দিয়ে পাশ ফিরে দেখলেন হাবুল কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। কাল সকালের দিকে গৌহাটি ঢুকে যাবে ট্রেন। তারপরে শুরু হবে খোঁজ। ঈশ্বর যদি ওঁর আদরের ভাগ্নিটির কপালে জীবন লেখেন তাহলে মৃত্যুর

কালো গ্রাস তার সামান্য ক্ষতিটুকুও করতে পারবে না। কপালে হাত ঠেকালেন অলোক।

১৬

"স্যার, ওই বয়স্ক মহিলা মারা গেছেন!"

ভোরের আলো ফোটার আগেই ফোনটা এল হাসপাতাল থেকে। ফোনটা কানে দিয়েই এই দুঃসংবাদ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল গৌরব। ও কী বলবে বুঝতে না পেরে শুধু বলল, "আমি এক্ষুনি আসছি, আপনার ওঁর বাড়িতে খবর দিন।"

নার্স আমতা আমতা করে বলল, "স্যার ডক্টর দাস বলছেন ওঁর বডিটা অন্যত্র শিফট্ করতে। ডক্টরের অনুমান মহিলার সেপ্টিসেমিয়া হয়ে গেছিল, যেটা বোঝা যায়নি। এখন বডিটা ইনফেকটেড। সেটা ওয়ার্ডে থাকলে অন্য পেশেন্টদের ক্ষতি হবে।"

"দ্যেন হোয়াই ইউ অ্যান্ড ইয়োর ডক্টর দাস ওয়েস্টিং টাইম! হোয়াট আর ইউ ওয়েটিং ফর?"

কিছুটা ঝাঁঝের সঙ্গে চিৎকার করেই বলে উঠল কথাটা গৌরব। এই ধরনের নেগ্লিজেন্সি সে মোটেও পছন্দ করে না।

নার্স আবার বলল, "তাও স্যার, পেশেন্টটা তো আপনার, ডক্টর দাস সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন না।"

"আমি ফ্রি হ্যান্ড দিলাম। মুভ দ্যাট বডি ফার্স্ট।" কথাটা বলেই গৌরব ফোনটা কেটে দিল। কাল রাতেও ও হ্যালুসিনেট করেছে। রূপা নিজের খাটে এখন আরাম করে ঘুমোচ্ছে। গৌরবের মনে হল ও পাগল হয়ে যাচ্ছে। তবে এখন এসব ভেবে লাভ নেই, হাসপাতালে যাবে বলে বাইরে বেরিয়ে এল ও।

এই ভোরবেলাতেও লিফট্ থেকে নামতেই অনেক মানুষের ভিড় দেখতে পেল গৌরব। সকলের মুখে কেমন একটা থমথমে ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন গৌরবের তিনতলার প্রতিবেশি অমল চৌধুরি। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অনেকে খুব নিচু স্বরে কথা বলছে।

এখানে আসা ইস্তক কারও সাথেই তেমন একটা আলাপ হয়নি গৌরবের। মেয়ের অসুস্থতার জন্য সাহায্য না চাইতে এলে হয়তো অমলবাবুর সাথেও আলাপ

হত না। তাই অমল চৌধুরির দিকেই এগিয়ে গেল গৌরব। তাঁকে ও জিজ্ঞেস করল, "এত ভিড় কীসের অমলবাবু? আর আপনার মেয়ে এখন কেমন আছে?"

উত্তর না দিয়ে অমল চৌধুরি কেঁদে ফেললেন। গৌরব বুঝতে পারল না এরপর কী করা উচিত! ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এক মিনিটের জন্য ভুলে গেল ওর এক পেশেন্ট মারা গেছেন তাই ওকে হাসপাতালে যেতে হবে। অমল চৌধুরির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোক উত্তর দিলেন গৌরবের প্রশ্নের, "কুয়াশা কাল অনেক রাতে মারা গেছে। ওর মামারা ওকে আনতে গেছে। এখনও একঘণ্টা বাদে ছাড়বে।"

হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে গৌরবের হাতটা চেপে ধরলেন অমল চৌধুরি। বললেন, "পারলাম না ডাক্তারবাবু। ওকে আর ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। ডাক্তার ঘোষাল একটা মেডিকেল টিম বসালেন। বিদেশ থেকে ডাক্তার এল। এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের কোনো ফলই পাওয়া গেল না।"

কিছু সময়ের জন্য গৌরব স্তম্ভিত হয়ে গেল। নানা কাজের চাপ। স্ত্রীয়ের অসুস্থতা, নিজের অসুস্থতা এসব করতে গিয়ে মেয়েটার খোঁজ নেওয়া হয়নি। হঠাৎ ওর মনে মধ্যে কেউ যেন বলে উঠল, রূপার মধ্যেই কোনো ভয়ংকর সত্য লুকিয়ে আছে। কোনো মানসিক সমস্যা নেই গৌরবের। ও যা দেখছে সব সত্যি। সাথে সাথেই আবার বেজে উঠল ওর ফোনটা। হাসপাতাল থেকে নার্স ফোন করেছে। বেশ বিরক্ত হল ও, বলে দেওয়ার পরেও এরা যে কেন কাজ করতে পারে না!

"পেশেন্টকে শিফট্ করানো হয়নি এখনও?" বেশ চেঁচিয়েই কথাটা বলল গৌরব।

ওদিক থেকে নার্স হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "না স্যার! সেই জন্য আপনাকে কল করিনি। যেটা বলার জন্য ফোন করেছি সেটা হল, ওই বাচ্চা ছেলেটার শরীর হঠাৎ খারাপ হয়েছে। ওর খুব জ্বর, গায়ে লাল লাল র‍্যাশ উঠেছে। আপনি এক্ষুনি আসুন স্যার!"

সেই মামি পক্স! স্তব্ধ হয়ে গেল গৌরব। "ছেলেটা কি কথা বলতে পারছে?" নার্সকে জিজ্ঞেস করল ও।

"না স্যার, পারছে না।"

ফোনটা কেটে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গৌরব গলা চড়িয়ে বলল, "আপনারা যারা কুয়াশার সংস্পর্শে আসতে চলেছেন তাঁদের আগাম সতর্ক করে দেওয়া

আমার কর্তব্য। মামি পক্স নামের একটা রোগের কারণে ওর মৃত্যু হয়েছে। মনে হচ্ছে রোগটা সংক্রামক। এই মুহূর্তে খবর পেলাম আমাদের হাসপাতালেও একজন পেশেন্টের এই রোগ হয়েছে। কাজেই সাবধানতা অবলম্বন করুন। ডেডবডি ছোঁয়ার সময় হাতে গ্লাভস পরে নিন। যদিও ডেডবডি থেকে এর সংক্রমণ হয় কিনা তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু কারও এই রোগ হয়েছে শুনলে তার সংস্পর্শে না যাওয়াই ভালো। এই রোগের উপসর্গই হল পক্সের মতো লাল র‍্যাশেস্ বেরোনো, প্রবল জ্বর আর কথা বন্ধ হয়ে যাওয়া। এমন উপসর্গ দেখা দিলেই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। যারা রোগীর খুব কাছাকাছি থাকবে তারা ফেসমাস্ক ব্যবহার করুন।”

কথা শেষ করে গৌরব অমল চৌধুরিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, “আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরছি। মন শক্ত করুন। নিজেদের খেয়াল রাখুন।”

গাড়ি স্টার্ট দিয়েই নিমেষের মধ্যে গৌরব বেরিয়ে গেল হাসপাতালেন উদ্দেশে। গাড়ি চালাতে চালাতেই ও ফোন করল ডাক্তার ঘোষালকে। তিনি ফোন তুলেই আক্ষেপের স্বরে বললেন, “তোমার পরিচিত মেয়েটিকে বাঁচাতে পারলাম না গৌরব!”

গৌরব উত্তর দিল, “আমি জানি স্যার! ডাক্তার গৌতম সেনের রিপোর্ট অনুযায়ী এই রোগের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করারও নেই। উনি লিখেছিলেন এই রোগ যেমন নিজে থেকেই এসেছিল আবার কিছু প্রাণ নিয়ে নিজে থেকেই চলে গেছিল। আমাদের অ্যালার্ট থাকা ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নেই। আমাদের হাসপাতালে আমার আন্ডারে ভর্তি থাকা একটা এগারো বছরের ছেলের ওই রোগের উপসর্গ দেখা গেছে। আমি হাসপাতালে যাচ্ছি, যদি পারেন আপনিও একবার চলে আসুন স্যার।”

ডাক্তার ঘোষাল সব শুনে বললেন, “স্ট্রেঞ্জ! কুয়াশার সংস্পর্শে তো সেই ছেলেটি আসেনি, তাহলে কীভাবে... আচ্ছা আমি এক্ষুনি তোমাদের হাসপাতালে পৌঁছচ্ছি।” ফোনটা কেটে দিলেন তিনি। ডাক্তার গৌতম সেনের রিপোর্ট অনুযায়ী সেইসব লোকেরাই আফ্রিকাতে ইনফেকটেড হয়েছিল যারা জঙ্গলের ভেতর গেছিল। তাদের সংস্পর্শে আসা কিছু মানুষও ইনফেকটেড হয়। কিন্তু এত দূরে থাকা দু'জন কীভাবে এই রোগের শিকার হল কিছুতেই মাথায় আসছে না ওঁর। তাহলে কি এদেশে এসে এই রোগ তার নেচার বদলে ফেলছে! এইভাবে

চলতে থাকলে তো মহামারি লেগে যাবে। অনেক চেষ্টা করেছের ওঁরা কুয়াশাকে বাঁচানোর, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মেয়েটার শরীরটা ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হোক, তাহলে যদি কিছু জানা যায়। তিনি হাসপাতালে ফোন করে বললেন, এখনই পেশেন্টপার্টিকে বডি না দিতে। কিছু মেডিকেল ইমারজেন্সি এসেছে সেই কারণে ওরা বডিটা রাখতে চায় এটা যেন বুঝিয়ে বলা হয়।

১৭

হরিনারায়ণ শাস্ত্রী অনেক সময় নিয়ে রূপার কুষ্ঠিটা দেখলেন। এমন কালসর্প যোগের প্রভাব এর আগে তিনি দেখেননি। তুলা রাশিতে রবি নিচস্থ, বৃশ্চিক লগ্নের জন্মছকে কর্কটে মঙ্গলও নিচস্থ হয়েছে। চন্দ্র লগ্নে অবস্থান করছে সেই নিচস্থ হয়েই। দ্বিতীয়তে কেতু আর শুক্র বসে আছে। সংসার করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না মেয়েটা। তিনি ডাকিনী সিদ্ধ তান্ত্রিক। তাঁর মায়ের চরণে কুষ্ঠিটা রেখে বিড়বিড় করে কী যেন বললেন একটা। সারা জীবন মা-ই তাঁকে পথ দেখিয়ে এনেছেন। সেই রাজরাপ্পায় রাতে কঠিন সাধনা করে দেবীর আশীর্বাদ পেয়েছিলেন তিনি। জমিদার মশাই গেছিলেন মা ছিন্নমস্তা সাধনায়। পেয়েছিলেন রক্ষাকবচরূপী প্রাচীন একটা গোমেদ পাথর।

চোখ বুজলেন হরিনারায়ণ। বন্ধ চোখের ভেতর সব যেন ছবির মতো পরিষ্কার হতে শুরু করল। মায়ের আশীর্বাদ আবার পেয়েছেন তিনি। লাল বর্ণের ডাকিনী দেবী দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সম্মুখে। বরাভয় মুদ্রায় হাত তুলে আছেন তিনি। ভয় নেই আর ভয় নেই। একটা ময়ূর উড়ে এসে দেবীর কাঁধের ওপর বসল। দেবীর পায়ের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে তিন তিনটে বেজি। দৃশ্যটা মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। হরিনারায়ণ দেখলেন বিষের জ্বালায় ছটফট করছে একজন মানুষ। তাঁর পেট অবধি নেমে এসেছে দাড়ির জঙ্গল, কালো আলখাল্লায় মানুষটার শরীর ঢাকা পড়েছে। এক সময়ে মানুষটা ছটফট করতে করতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কেউ যেন রূপার নাম ধরে ডাকল। সে একজন সুদর্শন পুরুষ! কালো আলখাল্লা পরা লোকটার সামনে একটা কালো রঙের সাপ পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছিল। সেই সাপটা ফণা তুলল। তারপর সব কেমন যেন মিলিয়ে যেতে লাগল।

চোখ খুললেন হরিনারায়ণ শাস্ত্রী। তিনি যা দেখেছেন তার অর্থ কিছুটা

হলেও বোধগম্য হচ্ছে। মেয়েটাকে এমন কোনো শক্তি নিজের নাগপাশে জড়িয়ে রেখেছে যে শক্তি কোনো সাধারণ শক্তি নয়। সর্পতান্ত্রিকেরাও সেই শক্তির সঙ্গে পেরে উঠবে না। দাড়িওয়ালা লোকটা যে সর্পতান্ত্রিক সেটা ভালো করেই বুঝতে পারছেন হরিনারায়ণ।

এখন অনেক রাত হয়েছে। হরিনারায়ণের কাছে কোনো ফোন নেই। কাজেই তিনি নিয়তিকে এক্ষুনি সব জানাতে পারবেন না। উদ্ধারের একটা পথ দেবী তাঁকে দেখিয়েছেন, হাঁটতে হবে সেই পথ ধরেই।

১৮

বাচ্চা ছেলেটার অবস্থা বেশ ক্রিটিকাল। পোস্ট অপারেশন সময়ে এতবড় একটা রোগের ধকল সহ্য করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে গৌরবের বেশ সন্দেহ আছে। এখন সকাল দশটা আকাশে মেঘের বহর দেখে তা বোঝার উপায় নেই। বাইরে তাকালে মনে হচ্ছে সন্ধে ছ'টা বেজে গেছে। এমন আকাশ নিম্নচাপের পূর্বাভাস বয়ে নিয়ে আসে।

হাসপাতালের রেস্টরুমের পাশ থেকে যেতে যেতে গৌরবের চোখ পড়ল টিভির পর্দায়। সত্যিই সেখানে বার বার দেখানো হচ্ছে, গাঙ্গেয় উপকূলবর্তী অঞ্চলের দিকে একটা ঝড় এগিয়ে আসছে এই কারণে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে সকলকে। আগামী দু'দিন ভারী বর্ষণের সম্ভাবনার কথাও বলা হচ্ছে।

রেস্টরুমের পর থেকেই শুরু হয়েছে লম্বা একটা বারান্দা। বারান্দার একেবারে শেষপ্রান্তে স্টাফদের ওয়াশরুম আছে। গৌরব সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। এলোমেলো চিন্তা আর মানসিক চাপের ফলে খুব ক্লান্ত লাগছে ওর। যদি ঘাড়ে মাথায় একটু জলের ঝাপটা দিলে আরাম পাওয়া যায়!

স্টাফ ওয়াশরুমটার সামনেটা একেবারে ধু ধু ফাঁকা। এই সকালেও গৌরবের গা ছমছম করে উঠল। কেন যে এমন হল ও বুঝতে পারল না। ওয়াশরুমে ঢুকে পড়ল ও। ভালো করে আঁজলা ভরে জল নিয়ে ঘাড়ে আর তালুতে দিতে লাগল। শার্টের অনেকটা ভিজে গেল সেই জলে। চোখ তুলে ও আয়নার দিকে তাকাল। পেছনে ওরা কারা দাঁড়িয়ে আছে! চোখের দৃষ্টি তখনও জলের কারণে ঝাপসা থাকায় গৌরব ঠিক পরিষ্কার করে কিছু দেখতে পেল না।

“মহামারি লেগে গেছে ডাক্তার। ওই সাপিনী সব শেষ করে দেবে এবার।”

গলার স্বরটা কানে এসে পৌঁছতেই গা-টা শিরশির করে উঠল গৌরবের। এই গলার স্বর ওর চেনা! চোখটা মুছে ভালো করে আয়নার দিকে তাকাতেই ও চমকে উঠল। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সেই বৃদ্ধা যিনি মারা গেছেন। দ্রুত পেছন ঘুরল গৌরব। নাহ্, কোনো ভুল হয়নি। এখন তিনি ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘামতে লাগল গৌরব। ওর পা দুটো যেন আটকে গেছে মাটির সঙ্গে। পালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাটুকুও যেন হারিয়ে গেছে।

“ভয় পাস না ডাক্তার। ডাইনি মানেই খারাপ হয় না রে। তুই আমায় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছিস। আমার ভাগ্য, আমি আর বাঁচলাম না। ওই শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না।” কথা বলতে বলতেই বৃদ্ধা হাত বাড়িয়ে একটা জিনিস গৌরবের দিকে এগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, “এই নে ডাক্তার। এটা ওই বাচ্চাটার বালিশের তলায় রেখে দিস। ওকে যমেও ছুঁতে পারবে না। আর ঠিক দুটো মৃত্যু সংবাদ শুনবি তুই তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে!”

পরক্ষণেই গৌরবের মনে হল সামনে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। নিজের মাথার চুলগুলো হাতের দুই মুঠিতে চেপে ধরল ও। আবার হ্যালুসিনেশন! এবার আর সন্দেহ নেই ও পাগল হয়ে যাচ্ছে। নিজের ওপর, নিজের মনের ওপর আর বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ থাকছে না আর ওর। ‘ডাক্তার ভট্টাচার্য!’ বলে জোরে চিৎকার করে উঠল ও নির্জন ওয়াশরুমের ভেতর। তখনই ওর অনুভূতি হল মাথায় কোনো কাঁটার খোঁচা লাগছে! যে হাতটা দিয়ে ও চুলের মুঠি চেপে ধরেছিল সেই হাতটা চোখের সামনে আনতেই দেখতে পেল একটা ফল সেই হাতের তালুর ওপর রয়েছে। এই ফলটা গৌরব চেনে। মা নীলষষ্ঠীর দিন এই ফল মহাদেবের মাথায় দেন প্রতিবছর। ফলটার গায়ে অসংখ্য কাঁটা।

তাহলে তো সবটা মিথ্যে নয়। গৌরব ঘোরের মধ্যে সবকিছু দেখছে না। যা দেখছে তা ওর সামনে সত্যিই ঘটেছে তাই ও দেখেছে। ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে স্পেশাল কেয়ার ইউনিটের দিকে ছুটে গেল গৌরব। দরজা খুলে দেখল তখনও ডাক্তার ঘোষাল ছেলেটার ওপর ঝুঁকে পড়ে ওকে পরীক্ষা করে চলেছেন।

গৌরব ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ফলটা ছেলেটার বালিশের তলায় রেখে দিল। ওর মন বলছে এবার ছেলেটা বেঁচে যাবে।

অপরদিকে

গৌহাটির একটা মোটামুটি হোটেলের একটা ঘরে চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিলেন অলোক সামন্ত। হাবুল ওঁর দিকে একমনে তাকিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝেই সে উসখুস করছে। অধৈর্য হয়ে পড়ছে কোনো উত্তর না পেয়ে। ওদিকে খাতার সাদা পাতাগুলোর দিকে একভাবে তাকিয়ে বসেছিলেন অলোক। ওঁর মন বলছে সর্প তান্ত্রিকের ব্যাপারটা এখান থেকেই পাওয়া যাবে। অকারণে মানুষ খাতার অতগুলো পাতা ফাঁকা রাখতে পারে না।

হঠাৎ কী যেন মনে হতে হাবুল বলল, "মামা, কোনো ম্যাজিক নেই তো এর মধ্যে?"

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই হাজার পাওয়ারের বিদ্যুতের শলাকা যেন চেপে ধরল অলোক সামন্তকে। তিনি পিঠ চাপড়ে দিলেন হাবুলের। মনে মনে বললেন, এই ছেলে একদিন অনেক নামডাক করবে। ম্যাজিক শব্দটা কানে যাওয়ার সাথে সাথেই মাথাটা খুলে গেল তাঁর। শ্রীলঙ্কায় থাকার সময়ে তিনি একবার একটা রোড ম্যাজিক শো দেখেছিলেন। সেখানে ম্যাজিশিয়ান একটা কঙ্কালের খুলি সকলে সামনে রেখে বলেছিলেন– বন্ধুগণ... এই কঙ্কাল যে লোকের সে নিজের স্ত্রীকে হারিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল তাই আজও ওর কানে কানে ওর বউয়ের নাম জিজ্ঞেস করলে আমার এলবোর ওপর সেই নাম সে লিখে দিয়ে যায়। বিশ্বাস না হলে পরখ করুন। একটা পথ চলতি লোককে ডেকে সে একটা কাগজ পোড়াতে বলেছিল। তারপর সেই কাগজ পোড়া ছাই ওই ম্যাজিশিয়ানের এলবোর ওপর ডলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা নাম ফুটে উঠেছিল। সেখানে লেখা ছিল, 'সৌন্দর্য'।

ম্যাজিক ট্রিকের মধ্যে তেমন কোনো অসাধারণ ব্যাপার কিছুই ছিল না কিন্তু। কিছু সময়ের জন্য চমকে দেওয়ার কৌশল মাত্র, তাছাড়া আর কিচ্ছু নয়। অলোকেরই এক সহকর্মী ব্যাপারটা ওঁর কাছে খোলসা করেছিল, ম্যাজিশিয়ান লেবুর রস জাতীয় কিছু দিয়ে একটা নাম আগেভাগেই লিখে রেখেছিল নিজের হাতে। তারপর সবটাই নাটক আর চোখের ধাঁধা আর কিচ্ছু না। প্রাচীনকালে অনেক রাজা মহারাজারা তাঁদের গুপ্ত চিঠি পাঠাতেন এইভাবেই। আগুনের ওপর ধরে থাকলে চিঠিটা আগুনের ভাপে ধীরে ধীরে কালচে হয়ে উঠত আর বেরিয়ে আসত আসল সংকেত। এই খাতার সাদা পাতাগুলোতেও তেমন কিছু দিয়েই সর্প তন্ত্রের গোপন কথা লেখা আছে। তবে এই খাতার পাতাগুলোকে আগুনের ওপর

মেলে ধরতে ভরসা পেলেন না অলোক সামন্ত। তিনি অন্য একটা উপায় বের করলেন। তিনি বললেন, "দেখো তো হাবুল, আমার ব্যাগের সামনের পকেটে একটা লাইটার পাবে, ওটা আমাকে দাও তো।"

কথা বলার সাথে সাথে কাজ হল। হাবুল দৌড়ে নিয়ে এল সেই লাইটারটা। সেই লাইটারটার পেছনে একধরনের আলো আছে। বোতাম টিপে টর্চের মতো জ্বালতে হয় সেটা। সেটা জ্বালিয়ে সাদা পাতাগুলোর নিচে রাখার সাথে সাথে ফুটে উঠতে লাগল নানা লেখা, সংকেত, যন্ত্র, মন্ত্র আর মানচিত্র। আসামের একটি গ্রামের মানচিত্র। গৌহাটি থেকে সেখানে কীভাবে যেতে হবে সেই পথের হদিশও সেখানে দেওয়া আছে। গ্রামের নাম এক জায়গায় খুঁজে পাওয়া গেল। গ্রামের নাম "চাঁদপুর"।

অলোক সামন্ত আক্ষেপ করে বললেন, "ইস্স্, সাথে যদি একটা পেন আর কাগজ থাকত এই মন্ত্র আর যন্ত্রগুলো লিখে আর এঁকে রাখা যেত।" আবার পরিত্রাতার ভূমিকা পালন করল হাবুল। সেকেন্ডের ভগ্নাংশে সে নিয়ে এল একটা ড্রয়িং খাতা আর পেন। একহাতে ওই খাতার কাগজের নিচে আলো ফেলতে লাগলেন অলোক সামন্ত আর অন্য হাতে আঁকার খাতার ওপর লিখে রাখতে লাগলেন যন্ত্র আর মন্ত্রের সংকেতগুলো। এরইমধ্যে দুপুরের খাবার ঘরে দিয়ে চলে গেল হোটেলের লোক। খাতাটা আলোর ওপরে ধরার কাজে অনেকটা সাহায্য করল হাবুল। অনেক রাত অবধি কাজ করার পর যখন সব শেষ হল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন অলোক। হাবুলের মুখটাও ঝলমল করে উঠল।

পরের দিন বেশ সকাল সকাল গাড়ির সন্ধানে বেরোল অলোক সামন্ত আর হাবুল। তার আগে অবশ্য দু'জনে একটা পুণ্যের কাজ সেরে ফেলেছে ভোর হতে না হতেই। কামাক্ষ্যার গর্ভগৃহে ঢুকেছিল ওরা। মহা ভক্তিভরে পুজো সারার পরে পুরোহিত ঠাকুর হাবুলকে একটা ফুল দিয়ে বলেছিলেন, তোমার জয় হোক!

চাঁদপুর নামটা অনেক ড্রাইভারেরই চেনা নয়। ঘণ্টাখানেক ঘোরার পরে ওদের বেশ হতাশ দেখাল। ঘাটে এসে শেষে নৌকোডুবি না হয়ে যায়! হতাশ অলোক একটা চায়ের দোকানে এককাপ চা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন এরপরে কী করা যেতে পারে। তখনই হাবুল একজন বয়স্ক লোকের সাথে কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল দোকানটার দিকে।

অলোকের কাছে এসে হাবুল বলল, "মামা ইনি হলেন রাঘব বড়ুয়া!

আসামের অনেক পুরোনো লোক। ইনি জানেন চাঁদপুর কোথায়!"

অলোক সামন্তর লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে হল ইউরেকা বলে, কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিলেন। এবার হয়তো তাঁর ভাগ্নির জীবনটা বেঁচে যাবে!

রাঘব বড়ুয়া নামের লোকটা বলল, "চাঁদপুরের নাম এখনকার ডেরাইভাররা অনেকেই জানে না গো। সেই কোন কালে যেতাম সেখানে। সাপের বিষ ঝাড়ানো হত সেখানে। কত সাপেকাটা লোক নিয়ে গেছি সে তল্লাটে। প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায় যায়, আমি গাড়ি চালাতাম ঝড়ের বেগে। যখন লোকগুলো বেঁচে ফিরত কী যে আনন্দ হত। তাদের বাড়ির লোকেরা তিনগুণ টাকা দিত আমাকে। অনেক পয়সা করেছিলাম সে সময়ে। এখন গাড়ির ব্যবসা ছেলেদের ঘাড়ে দিয়ে দিয়েছি। ওদের মা চলে গেছে। আমি একা লোক, গাড়িফাড়ি আর চালাই না। আপনারা চাঁদপুর খুঁজছিলেন শুনলাম স্ট্যান্ডের এক ডেরাইভারের কাছে। নামটা শুনতেই আবার আগুন জ্বলে উঠল বুকের ভেতর। চলেন ছ্যার, আমি আপনাগো লইয়া যামু..."

শেষটায় আবেগে লোকটার নিজের ভাষা বেরিয়ে এল মুখ থেকে। অলোক জিজ্ঞেস করলেন, "কত দিতে হবে?"

রাঘব হেসে বলল, "গাড়ি, আমি আর তেল মিলাইয়া ১২০০ ট্যাকা যতদিন সময় লাগবে!"

"আর একটু কম করা যায় না জেঠু?" হাবুল কাকুতির স্বরে বলল।

মায়াভরা চোখে তাকাল রাঘব হাবুলের দিকে। তারপর বলল, "বাচ্চা ছেলেটার কথা শুনে হাজার করছি। আর নামুম না।"

অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে চলতে লাগল গাড়ি। রাঘব পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, সাড়ে ছয় থেকে সাত ঘণ্টা লাগার কথা হেই পথে। বয়েস কম হয় নাই। তবুও পথ ভুলি নাই।"

সন্ধে সাতটা নাগাদ একট নির্জন পাহাড়ি গ্রামের কিনারে দাঁড়াল গাড়িটা। রাঘব গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে বলল, "এই যে চাঁদপুর। এই গাঁয়ের নাম চাঁদপুর হওয়ার কারণ কী জানেন?"

অলোক মাথা নাড়লেন দু'দিকে। তিনি জানেন না। তবে মনের ভেতর একটা নাম এসে ধাক্কা মারল। চাঁদ সদাগর! কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। বলল হাবুল, "মনসার গল্পের চাঁদ বণিকের নামেই কি এই নাম হয়েছে?"

ঝলমল করে উঠল রাঘবের মুখ। সে বলল, "তোমায় দেইখ্যাই এই ভার

কাঁধে লইছি। তুমি বিস্ময় কিশোর। সব বিপদ কেটে যাবে দেখো, শুধু তোমার জন্যই সব বিপদ কেটে যাবে। এই গ্রামের সবচেয়ে বলশালী সাপের ওঝা হল ধনাবাবা! আমি ওর সাথে কথা বলব।”

অলোক আর হাবুলকে দাঁড় করিয়ে রেখে রাঘব চলে গেল গ্রামের ভেতর। রাতের পাহাড়ি রাস্তায় বেশ শীত শীত একটা ভাব আছে। এই মরশুমে সেটা আরামদায়ক নয় বরং কষ্টকর। অলোক আর হাবুল দাঁড়িয়ে রইল গাড়ির পাশে। ভাগ্যিস সাথে গরম জামা ছিল!

আধঘন্টা কেটে যাওয়ার পরে হাবুল দেখতে পেল একজন কালো আলখাল্লা পরা লোকের সঙ্গে এগিয়ে আসছে রাঘব বড়ুয়া।

১৯

ডাক্তার দেবল ভট্টাচার্যের মৃত্যু সংবাদটা শোনার পরে স্তম্ভিত হয়ে নিজের চেম্বারে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকল গৌরব। দেবলের পরিচারক দেবলকে খুঁজে পেয়েছে নিজের বাড়ির চেম্বারে। তখন তাঁর শরীরে আর প্রাণ ছিল না। সারা গায়ে ছিল ছোট ছোট লাল রঙের র‍্যাশ।

গৌরব আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। সে বেরিয়ে এল হাসপাতাল থেকে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ওই মেয়েটার মধ্যেই এই সমস্যার বীজ লুকিয়ে আছে। এপিসি রোডের ওপর খুব স্পিডে গাড়ি চালিয়ে দিল ও। ভেঙে ফেলল দুটো সিগনাল। যা হবে পরে দেখা যাবে। মাত্র পনেরো মিনিটেই পৌঁছে গেল নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। ওর মন ভারী হয়ে এল অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে। আজ কুয়াশার দাহ হয়নি। ডাক্তার ঘোষাল ওকে হাসপাতালেই বলেছেন, আজ মেয়েটার দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। শেষ যাত্রার জন্য যারা এসেছিল তারা হয়তো অপেক্ষা করতে করতে বাড়ি ফিরে গেছে। মেয়েটার অভাগা বাবাও চলে গেছে নিজের ঘরে।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা স্বল্প চেনা গলার স্বর শুনতে পেল গৌরব। কেউ যেন ডাকলেন, “বাবা গৌরব একটু শুনবে?”

গৌরব পেছন ফিরে দেখল রূপার কাকিমা শ্রীমতি নিয়তি নিয়োগী দাঁড়িয়ে আছেন। ও দ্রুত ছুটে গেল নিয়তির কাছে। তিনি খুব শান্ত গলায় বললেন, “জানি

না তোমরা এসবে বিশ্বাস করো কিনা, আমি তোমার বাড়িতে একজনকে আনতে চাই যদি অনুমতি দাও!"

গৌরব লজ্জিত গলায় বলল, "এ কী বলছেন কাকিমা! অবশ্যই আপনি যা ভালো মনে করবেন তাই করবেন।"

নিয়তি বললেন, "আমি জানি, তোমরা ভালো নেই। আমার খুড়শ্বশুর সব বলে গেছেন মারা যাওয়ার সময়ে। জানি রুপুর ওপর অনেক ঝড় যাচ্ছে, তাই ছোড়দাদুর মৃত্যুর খবর ওকে জানানো হয়নি। তুমি আমার সাথে চলো বাবা।"

"কোথায় যেতে হবে কাকিমা?" প্রশ্ন করল গৌরব।

ছোট্ট উত্তর দিলেন নিয়তি, "কুমোরটুলি!"

* * * * * * * * *

গাড়িটা ছুটে চলেছিল রাস্তা ধরে। সন্ধে সাতটার একটা ফ্লাইট পাওয়া গেছে কলকাতা ফেরার। দুর্জয় ওঝার কাছে নিজের পরিচয়পত্র ছিল এই রক্ষে। না হলে কিছুটা সমস্যায় তো পড়তেই হত। হাবুলের হাতে সর্পদণ্ডটা দেখেই দুর্জয় চেঁচিয়ে উঠেছিল, "এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে? এ মহা ভয়ানক জিনিস! ওই লাঠিতে যে সাপদুটো আছে তাদের এদেশে দেখা যায় না। অনেক বছর আগে আমি এই সাপ দেখেছিলাম। এরা হল ব্ল্যাক মাম্বা। আমি আজ সর্প তান্ত্রিকদের মধ্যে বসবাস করি ঠিকই। প্রকৃতিই একদিন আমাকে এখানে এনে ফেলেছিল, তারপর আর ফিরে যেতে পারিনি। সাপ এক অদ্ভুত নেশার প্রাণী রে ভাই! সাপের বিষ নিয়ে গবেষণা করতে করতে একদিন সর্পতান্ত্রিক হয়ে যাব এ কি কখনো ভেবেছিলাম জীবনে! সর্পতান্ত্রিকদের সঙ্গে থাকতে থাকতে জেনেছি অনেক কিছুই, শিখেছিও বিস্তর। আমার মন বলছে ওই দণ্ডটা ভয়ংকর কোনো বিপদ ডেকে এনেছে।"

হাবুল দুর্জয় ওঝার হাতটা চেপে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল, "এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে আপনি আমাদের সাথে যাবেন?"

কী যেন এক মায়া দেখেছিল দুর্জয় হাবুলের দুইচোখে। একদিন ওর নিজের পরিবার ছিল, একটা ছেলে ছিল একটা মেয়ে ছিল। কিন্তু এই সাপের নেশায় সবকিছু ভুলে এখানে চলে এসেছিল ও। রপ্ত করে ফেলেছিল সর্প তান্ত্রিকদের জীবনযাপন। "যাব রে বাপ, যাব!" উত্তর দিয়েছিল দুর্জয়।

আর দেরি না করে সামান্য কিছু সরঞ্জাম নিয়েই দুর্জয় বেরিয়ে এসেছিল ওর বাড়ি থেকে। গাড়িতে ওঠার আগে একবার স্পর্শ করেছিল সর্পদণ্ডখানা। সারা শরীরে আগুন জ্বলে উঠেছিল যেন ওর। চোখ বন্ধ করে ও দেখতে পেয়েছিল একটা মেয়ে বসে আছে একটা বাড়ির ছাদের কোনায়। অমাবস্যার অন্ধকারের মতো তার গায়ের রঙ, মেয়েটার মাথার চুলগুলো জটায় ভর্তি। সেগুলো যেন জটা নয়, সরু সরু বিষধর এক একটা সাপ! দুর্জয় শিউরে উঠেছিল। চিৎকার করে বলে উঠেছিল, "আজ রাতটা বড় খারাপ গো, এই দণ্ড যে দেবীর তিনি আজ জেগে উঠবেন গো। যার শরীরে তিনি আছেন তার আর কালকের সূর্য দেখা হবে না।"

হাবুল পা জড়িয়ে ধরেছিল দুর্জয়ের, "সে আমার দিদির শরীরে বাসা বেঁধেছে। আপনি আমাদের বাঁচান।"

গাড়ি চলতে শুরু করেছিল। অলোক আর দেরি না করে এক এজেন্টকে ফোন করেছিলেন, যাতে আজ সন্ধ্যের তিনটে কলকাতা ফেরার টিকিট পাওয়া যায়। এজেন্ট আশ্বস্ত করেছিল ওঁকে। তবে সাথে একটা করে পরিচয়পত্র থাকা জরুরি সেটাও জানিয়ে দিয়েছিল। হাবুলের স্টুডেন্ট কার্ডটা তো ছিলই। দুর্জয়েরও পরিচয়পত্র সাথে ছিল। এবার অলোক দুর্জয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ত্রিলোকেশ্বর নিয়োগীর খাতাজোড়া আর দ্বিতীয় খাতা থেকে উদ্ধার করা সেই অতি গোপন করে রাখা মন্ত্র-তন্ত্রের বিধিগুলো।

দুর্জয় আঁকার খাতাটার দিকে মন দিয়েছিল। পাতার পর পাতা একনিশ্বাসে পড়ে চলেছিল সে। আর মাঝে মাঝেই মাথা নাড়ছিল। যেন কিছুর ইঙ্গিত পাচ্ছিল লেখাগুলো থেকে। গাড়ি এগিয়ে চলেছিল আপন গতিতে। মাঝে মাঝে অলোক তাড়া দিচ্ছিলেন বড়ুয়াকে একটু দ্রুত চালানোর জন্য। এয়ারপোর্ট অন্তত একঘণ্টা আগে ঢুকতেই হবে।

বিকেল নেমে আসার আগে আগে আঁকার খাতাটা দেখা শেষ করেছিল দুর্জয়। তারপরেই কী মনে হতে ত্রিলোকেশ্বর নিয়োগীর দ্বিতীয় খাতাটা খুলে সেই হাতে আঁকা ছবিটা দেখে চমকে উঠেছিল। বলেছিল, "আমি যেন এই মূর্তি কোথাও দেখেছি।" বেশ কিছুক্ষণ ভাবনার জগতে হারিয়ে গেছিল সে। হাবুল ওর দিকে একমনে চেয়েছিল। তখনই দুর্জয়ের মনে পড়েছিল। ও বলেছিল, "এই দুনিয়ায় সাপকে ভয় পায় না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই যুগ যুগ ধরে মানুষ একজন দেবী বা দেবতাকে সাপেদের দেবী বা দেবতা বলে পুজো করে

আসছে। শ্রদ্ধা করে আসছে। অবশ্য সেই শ্রদ্ধার মধ্যে ভক্তির চেয়ে ভয়েই আছে বেশি। এই যেমন আমাদের মনসা, মিশরের রুন্নৎ, তেমনই ইনিও একজন দেবী। আমাদের গ্রামের নাম চাঁদপুর হল কেন জানেন?"

প্রশ্নটা দুর্জয় করেছিল অলোক সামন্তর দিকে চেয়ে। তিনি উত্তর দিলেন, "সঠিক বলতে পারব না কেন এ নাম দেওয়া হয়েছে, তবে আমার অনুমান হল, আপনারা সাপের বিরুদ্ধাচারণ করেন। ঠিক যেমন চন্দ্রনাথ বণিক করেছিলেন। সেই কারণে চাঁদপুর হতে পারে।"

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুর্জয়ের মুখ। সে বলল, "আপনার অনুমান ঠিক। যিনি এই গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন তিনি ছিলেন একজন বাঙালি ওঝা। নিজেকে তিনি ধন্বন্তরির বংশধর বলতেন। সাপ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আসামের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে সাপের বংশ ধ্বংস করাই ছিল তাঁর কাজ। বিষবিদ্যায় তিনি ছিলেন পারদর্শী, যে কোনো সাপের বিষ তিনি ঝাড়তে পারতেন অনায়াসে। মনসার বদলে তিনি চন্দ্রনাথ বণিককে দেবতার আসনে বসিয়েছিলেন। গাঁয়ের নাম রেখেছিলেন চাঁদপুর। এছাড়াও চাঁদপুরের আর একটা বৈশিষ্ট আছে, এখানে পাহাড়ের মাথায় চাঁদ এমনভাবে লেগে থাকে যেন মহাদেবের ললাটে শশী! তবে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ওঝার মৃত্যুও হয় সেই সাপের বিষেই। আমাদের সেই গাঁয়ের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুও হয়েছিল সাপের বিষেই।"

অলোক সামন্ত বললেন, "খাতাটা পড়লে আপনি জানতে পারতেন, যে দেবীর ছবি আপনি দেখছেন তাঁর নাম হল মামি ওয়াটা। আফ্রিকান উপজাতিদের দেবী উনি। যাইহোক, ওই আঁকার খাতায় আমি যে সংকেতগুলো লিখেছি ত্রিলোকেশ্বরের লেখার অবলম্বনে তার অর্থ কী?"

"মামি ওয়াটা!" নামটা উচ্চারণ করে দুর্জয় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, "আমি যখন সাপ নিয়ে গবেষণা করতাম তখন একবার একটা জার্নালে এই দেবীর ছবি দেখতে পাই। তখন আমার বয়েস অনেক কম। যিনি সেই জার্নালে লিখেছিলেন তিনি ছিলেন একজন বাঙালি ডাক্তার। আমি এখানে আসার পরে একবার, মাত্র একটিবার তাঁকে দেখেছিলাম আমাদের গুরুদেবের সাথে। তার একদিন পরেই তিনি ফিরে যান। আর তাঁর দেখা কখনো পাইনি।"

"আপনি আমার কথার উত্তর দিলেন না!" অলোক আরও একবার প্রসঙ্গটা

জানতে চাইল খাতার ওই সংকেতগুলোর।

দুর্জয় বলল, "ও হ্যাঁ, দেখেছেন একদম ভুলে যাচ্ছিলাম। ওতে লেখা আছে প্রাচীন সর্পমোহিনী বিদ্যার নানা নিয়ম কানুন। এই বিদ্যা এসেছিল তিব্বতের এক অতিপ্রাচীন মঠ থেকে। এই বিদ্যার ফলে সাপের বিষকে অমৃতে রূপান্তরিত করা যায় আবার জলকে সাপের বিষে রূপান্তরিত করা যায়। এই বিদ্যা বড় জটিল এবং ভয়ংকর। সমস্যা হচ্ছে সাধারণ সর্প ওঝারাও একবার দেখলেই এর সংকেত উদ্ধার করতে পারে। তাই অতি গোপনীয়তার সাথে একে লুকিয়ে রাখার বিধান আছে। না হলে যে অনর্থ হয়ে যাবে। সুযোগ সন্ধানীরা পানীয় জলকে বিষ বানিয়ে লাখ লাখ মানুষের প্রাণ নিয়ে নেবে। সারা পৃথিবী জুড়ে চলবে মৃত্যুর ব্যবসা। এই বিদ্যা দিয়ে সারিয়ে তোলা যেতে পারে হাবুলের দিদিকেও।"

হাবুল আর অলোক সামন্ত একসাথে চাইলেন দুর্জয়ের দিকে। হাবুল ধৈর্য ধরে রাখতে না পেরে বলল, "সত্যিই দিদি ভালো হয়ে যাবে?"

"যিনি এই বিদ্যার সংকেত লিখে গেছেন তিনি হয়তো শাপমুক্তির উপায়ই খুঁজছিলেন। তবে সেক্ষেত্রে আমার চারটে প্রাণীর প্রয়োজন হবে। যার তিনটে হল তিনটে বেজি বা নেউল। আর একটা ময়ূর।" বলল দুর্জয়।

অলোক সামন্ত আর হাবুলের মুখটা শুকিয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। কলকাতা ফিরে এইসব প্রাণী জোগাড় করা একপ্রকার অসম্ভব। তাও একবার চেষ্টা করলেন অলোক। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে ফোন করলেন যিনি পশুপাখির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। সেই ভদ্রলোক বললেন, তিনটে বেজির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বেজি সাধারণত কেউ পোষে না। তাও কিছু মানুষের চাহিদার কারণে ওঁর সংগ্রহে রাখতে হয়েছে। তবে ময়ূর পাওয়া অসম্ভব।

অলোক ব্যাপারটা জানালেন দুর্জয়কে। দুর্জয় হেসে বলল, "তিনটে বেজি দিয়েই আপাতত কাজ চলে যাবে। ময়ূরের ব্যাপারটা একটা অন্য উপায় বের করে করতে হবে।"

* * * * * * * * *

হরিনারায়ণ শাস্ত্রী চেয়ে রয়েছেন গৌরবের দিকে। ওঁর মন বলছে পারলে এই

ছেলেটাই পারবে বিপদের মুখ থেকে সবাইকে উদ্ধার করতে। তিনি বললেন, "বাবা, তোমার হাতটা আমার হাতের ওপর রাখো তো।"

নিয়তি ইশারা করলেন গৌরবকে। গৌরব নিজের হাতটা হরিনারায়ণ শাস্ত্রীর হাতের ওপর রাখল। তিনি চোখ বোজার সাথে সাথেই চোখটা খুলে ফেললেন। কেমন যেন জোরে জোরে শ্বাস পড়তে লাগল বৃদ্ধের। গলার স্বর বদলে গেল তাঁর, "মেয়েটাকে তো সেই দেবীতে বদলে যেতে তুমি দেখেছ। আর ভেবে ভেবে হয়রান হচ্ছ যে তোমার মনের ভুল এসব। মনের ভুল নয় বাবা! যা দেখেছ সব ঠিক। ওর সাথে তোমার মিলন হয়েছে?"

গৌরব লজ্জিতভাবে মাথা নাড়ল কেবল।

"আর সময় নেই। আজ থেকেই তার রূপের পরিবর্তন হবে। সে আর মানুষ থাকবে না। আজ রাতের মধ্যেই মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনতে না পারলে সেই দেবী তাকে গ্রাস করে নেবেন। সবে তো তিনজন মরেছে, আর একজন মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে। আর কিছু মানুষের মধ্যে বিষ ঢুকেছে মাত্র। যদি তাকে আটকানো না যায়, তবে কাল থেকেই লেগে যাবে মহামারি। বিষের প্রভাবে গায়ে ঘা হয়ে মরে যাবে হাজার হাজার মানুষ।"

গৌরব হরিনারায়ণ শাস্ত্রীর কথা মন দিয়ে শোনার পরে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আমিও তো তার সংস্পর্শে এসেছি। তার সাথে আমার একবার মিলনও ঘটেছে। সেই বিষ আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি কেন?"

ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত বের করে হাসলেন হরিনারায়ণ। বললেন, "সে তোমার রক্তের কারণে। তুমি এমন কোনো মানুষের সন্তান, যিনি এই দেবীর সাথে সহবাস করেছেন। তিনি নিজের শরীরে বিষ ধারণ করেছেন। সেই বিষের প্রভাবেই পঙ্গু হয়ে মারা গেছেন। তবুও বাঁচিয়ে গেছেন মানুষের প্রাণ।"

গৌরব মাথা নিচু করে নিল। ও মনে মনে কিছুটা অবাকও হয়েছে। এই বৃদ্ধ মানুষটার পক্ষে জানা সম্ভব নয় এতকিছু। ওঁর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক শক্তি আছে! গৌরব খুব ধীরে ধীরে বলল, "হ্যাঁ আমার বাবা বিষক্রিয়ায় পঙ্গু হয়ে মারা গেছিলেন। তাঁর লেখা 'মামি পক্স' সংক্রান্ত আর্টিকেল অনেক জার্নালে ছাপা হয়েছিল একসময়ে। অনেক সেমিনারে এই রোগ ও সেই জার্নালে ছাপা আর্টিকেল নিয়ে অনেক আলোচনাও হয়েছে।"

"তোমার বাবার নাম কী ছিল?" মুখের হাসি অমলিন রেখে প্রশ্ন করলেন হরিনারায়ণ শাস্ত্রী।

"গৌতম সেন!"

হঠাৎ ঘরের মধ্যে নেমে এল পিন পতন নিস্তব্ধতা। এই নামটা নিয়তি যেন কোথাও শুনেছেন। কিন্তু কোথায় শুনেছেন মনে করতে পারলেন না কিছুতেই।

"দেখো বাবা, আমার অনেক বয়েস হয়েছে। আমি তাকে আটকাতে পারব না। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে হলেও না হয় অন্য কথা ছিল। সে প্রতিরোধ হানলে আমার শরীর কাঁচের দেয়ালের মতোই ভেঙে পড়বে। তুমিই পারবে তাকে আটকাতে। আর ভালোবাসা ভরে ডাকবে তোমার স্ত্রীকে। তাকে ওই নাগিনী যে জগতেই নিয়ে যাক জানবে এতটুকু ভালবাসাও যদি থেকে থাকে সে সেই ডাক ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তাকে ফিরে আসতেই হবে। এখন যাও বিকেল হয়ে এসেছে। হাতে সময় কমে আসছে।"

নিয়তি আর গৌরব উঠে আসছিলেন, পেছন থেকে ডাকলেন হরিনারায়ণ, "এই যে বাবা এটা নিয়ে যাও। আর একটা মনে রেখো বাবা, তোমার স্ত্রীয়ের মুক্তি হলেই তোমার জীবনে নেমে আসবে বড় বিপদ। মন শক্ত রেখো, না হলে বাঁচার উপায় নেই।"

গৌরব ফিরে তাকিয়ে দেখল হরিনারায়ণ শাস্ত্রীর হাতে ধরা একটা ময়ূরের পালক। তিনি বললেন, "এ জিনিস শ্রী হরির মাথায় শোভা পায়। কালসর্পের কালগ্রাসকে রুখে দিতে পারে এর এমন ক্ষমতা। নাও এবার এগিয়ে যাও।"

নিজের বিপদের কথা ভাবার সময় এখন গৌরবের নেই। সময় থাকলে জানতে চাইত কেমন বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছে ও। জানার ইচ্ছে আর হল না, মন সায় দিল না। রূপাকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে এখন, যে করে হোক!

২০

দুপুরবেলায় মেয়ের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দেবেশ নিয়োগী আর রূপার মা দেখেছিলেন দরজাটা হাট করে খোলা। মেয়েকে দেখতে এসেছিলেন ওঁরা। দরজা খোলা দেখে প্রথমটায় একটু ঘাবড়েই গেছিলেন দম্পতি। রূপার মা খুব সাবধানে

ভেতরে ঢুকে দেখেছিলেন সারা ফ্ল্যাট লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে। যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে ঘরের ভেতর দিয়ে। এ ঘর ও ঘর পাগলের মতো খুঁজে শেষে পেয়েছিলেন মেয়েকে।

রূপা অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিল খাটের ওপর। জ্বরে ওর গা পুড়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয়েছিল অন্য একটা উপসর্গ। মেয়েটা সারা খাটজুড়ে কেমন যেন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঘুরছিল। যেন একটা সাপ প্যাঁচ খাচ্ছে যন্ত্রণায়। ওকে ধরে রাখতে পারছিলেন না দেবেশ। বুঝতে পারছিলেন না কী করা উচিত। তারপর ধীরে ধীরে মেয়েটা শান্ত হয়ে গেছিল। জ্বর নামতে শুরু করেছিল। ওঁরা মেয়েকে শুইয়ে রেখে বাইরে বসার ঘরে এসে বসেছিলেন।

সন্ধ্যে নেমে এসেছে অনেক আগেই। নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন দেবেশ আর তাঁর স্ত্রী। হঠাৎ একটা শব্দ ভেসে এল রূপার ঘর থেকে। সেই শব্দে গা ছমছম করে উঠল দু'জনেরই। কেউ খুব করুণ সুরে কাঁদছে। মেয়েকে তাঁরা মানুষ করেছেন। মেয়ের হাসি, কান্না প্রত্যেকটা অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল। এই কান্না কিছুতেই তাঁদের মেয়ের নয়। দেবেশের স্ত্রী চোখেমুখে একরাশ আতঙ্ক নিয়ে তাকালেন স্বামীর দিকে। বসার ঘরে যে অল্প আলোগুলো জ্বলছিল হঠাৎ করেই সেগুলো বন্ধ হয়ে গেল। কাঁচের দরজার ওপার থেকে এসে পড়া সন্ধ্যের নীল আলোটুকু ছাড়া আর কোনো আলো নেই এখন।

আবার শোনা গেল সেই কান্নার শব্দ। দেবেশ উঠে দাঁড়ালেন জায়গা ছেড়ে। ওঁর স্ত্রী ওঁর হাতটা চেপে ধরলেন। এবার শোনা গেল প্রাণ জল করে দেওয়া একটা শব্দ। কয়েকশো সাপ যেন একসঙ্গে হিসহিসিয়ে উঠল। সেই শব্দে কান পাতা দায় হয়ে যায়।

দেবেশ দৌড়ে গিয়ে মেয়ের ঘরের দরজা খুলেই ছিটকে সরে এলেন সেখান থেকে। দু'হাতে চোখ চেপে ধরলেন নিজের। স্ত্রীকে বললেন, "এ আমি দেখতে পারব না। তুমি যাও।"

রূপার মা দরজা খুলে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখ থেকে যেন আর কথা সরছে না। সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর। খাটের ওপর যে বসে আছে সে কি রূপা! হাতুড়ির মতো ধাক্কা মারছে প্রশ্নটা মায়ের বুকে। নগ্ন কালো অন্ধকারের মতো এক নারীমূর্তি বসে আছে খাটের ওপর। তার মাথায় কিলবিল করছে গোছা গোছা সাপ। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে পশুদের

মতো ধারালো কয়েকটা দাঁত। বাইরের নীল আলোয় সেই মূর্তিকে আরও বীভৎস দেখাচ্ছে।

রূপার মা চিৎকার করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এল সেই নারীমূর্তি তাঁর দিকে। কালো নখর হাত দিয়ে চেপে ধরল তাঁর গলা। নারীমূর্তির হাঁ মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে চেরা জিভ। বেগুনি রঙের সেই জিভ যেন রক্তের নেশায় পাক খেতে লাগল। দেবেশ নিয়োগী স্ত্রীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন কিন্তু পারলেন না ওই শক্তির সঙ্গে। ওই নারীমূর্তি তাঁকে হাতের এক ধাক্কায় অনেকটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। হাতটা আর একটু হলে ভেঙেই যেত দেবেশের।

নারীমূর্তির মাথায় জটার মতো যে সাপগুলো কিলবিল করছিল তারা ছোট ছোট ফণা তুলে রূপার মায়ের মুখের খুব কাছে চলে এল। চোখ বন্ধ করে ফেললেন মহিলা। নিজের মৃত্যুকে দেখতে বড় কটু লাগে।

তখনই শোনা গেল, "দাঁড়াও রূপা! কী করছ তুমি? উনি তোমার মা।"

নারীমূর্তি সেই গলার স্বর শুনে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। সে ফিরে তাকাল গৌরবের দিকে। তার পরেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হেসে উঠল পৈশাচিক হাসি। সেই হাসির শব্দে দুলে উঠল সারা ঘর। জানালার কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

দেবেশ নিয়োগী কোনোমতে উঠে দাঁড়ালেন। দৌড়ে গেলেন স্ত্রীয়ের দিকে। নারীমূর্তি ততক্ষণে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে। তিনি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলেন। ধরে ফেললেন দেবেশ তাঁকে।

গৌরবকে অলোক সামন্ত ফোন করেছিলেন যে করেই হোক একটি ঘণ্টা আটকে রাখতেই হবে ওই পৈশাচিক শক্তিকে।

গৌরবের সংস্পর্শে এসে যেন সেই বীভৎস নারী শান্ত হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। সে পেঁচিয়ে ধরল গৌরবের শরীরটা। একটা দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন কানে কানে বলল সে গৌরবের। গৌরব কিছুই বুঝতে পারল না। ও বুঝতে পারল সেই নারীর শরীরের বাঁধন যেন ক্রমশ আরও শক্ত হচ্ছে। আরও পেঁচিয়ে ধরছে।

গৌরব সেই ময়ূরের পালকটা পকেট থেকে বের করে মাথায় চেপে ধরল সেই পৈশাচিক নারীর। বাঁধন আলগা হয়ে গেল। বিদ্যুৎবেগে সে ছিটকে সরে গেল। ক্রোধে চিৎকার করে উঠল। গৌরব বেশ বুঝতে পারল। এই ঘরের দরজা আটকে ও দাঁড়িয়ে থাকলে রূপার দেহে বাস করা ওই সর্পদেবীর ক্ষমতা নেই



বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার। ও দরজা আটকে দাঁড়াল। হাতে তখনও পালকটা ধরা।

দারুণ রাগে দেয়ালে ধাক্কা মারতে লাগল সেই নারী। চেরা জিভ বের করে উগড়ে দিতে লাগল নীল বিষ। গৌরব এখন জানে ওর কিছু হওয়ার নয়। ডাক্তার গৌতম সেনের ছেলে ও। যিনি নিজে থেকেই বিষ নিজের শরীরে নিয়েছিলেন। প্রয়োজন হলে ও-ও বিষ নিজের শরীরে নেবে।

বড় মায়া নিয়ে গৌরব ডাকল, "রূপা! আমি গৌরব। ও তোমাকে যত কষ্টই দিক, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবই।"

আবার পৈশাচিক হাসি হেসে উঠল সেই সর্পদেবী। মাথার ওপর ছোট ছোট সাপগুলো উগড়ে দিতে লাগল নীল বিষ। গৌরব জায়গা ছেড়ে সরল না। পিশাচিনীটা নিজের শরীরে ক্ষত তৈরি করতে শুরু করল। ওই শরীরকে যন্ত্রণা দেওয়া মানে রূপার ক্ষতি হওয়া। এবার আর সহ্য করতে পারল না গৌরব। ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। চেপে ধরল সর্পদেবীর দু'হাত। গৌরবের গায়ে একটা হিংস্র কামড় বসাল সেই মূর্তি। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল গৌরব।

"ওই রাক্ষসীটা আমার জীবন শেষ করে দিল। আমার ভালো লাগা মন্দ লাগা সবকিছুর ওপর নিজের অধিকার কায়েম করল। আমাকে দিয়ে যা খুশি তাই করাল। আমি আর পারছি না। ও এখন তোমাকেও যন্ত্রণা দিচ্ছে।"

সর্পদেবীর মুখ থেকে হঠাৎ শোনা গেল রূপার গলার স্বর। গৌরব কিছু বলতে যাওয়ার আগেই জানালার কাছে সরে গেল মূর্তিটা। "আমি মরে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে!" কথাটা বলতে বলতেই রূপা ঝাঁপ দিতে গেল জানালা খুলে। লাফিয়ে পড়ে গৌরব ওর পা টেনে ধরল। "বোকামি কোরো না রূপা। আমি থাকতে ও তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না। আমার বাবাকে যেমন একদিন নিয়েছিলে আমাকেও আজ নাও..."

আবার রূপার গলায় শোনা গেল পৈশাচিক হাসি। যার জন্য এতকিছু এসেছে সেই সময়। গৌরবকে আঁকড়ে ধরল সে। তার চোখে তখন প্রবল কামনার আগুন জ্বলছে যেন। গৌরবের হাত থেকে পালকটা পড়ে গেছে যেন কখন। ও চেষ্টা করেও খুঁজে পেল না সেটা। আর প্রতিরোধ গড়া যাবে না। আবার ও ভালোবেসে ডাকল, "রূপা..."

গৌরব বুঝতে পারল রূপা চেষ্টা করে চলেছে সর্পদেবীর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার। কিন্তু তার শক্তি এতটাই প্রবল যে পেরে উঠছে না। হঠাৎ

ঘরের মধ্যে কোথা থেকে যেন একটা বেজি এসে ঢুকল। ছিটকে সরে গেল রূপা। আরও একটা বেজি এসে ঢুকল ঘরে। এবার যেন কোণঠাসা হয়ে গেল সেই নারীমূর্তি। সস্...সস্...স্... শব্দে সারা শরীর যেন হিম হয়ে যেতে চাইল সকলের।

ওদিকে শোনা যেতে লাগল,

বাসুকী, অনন্ত, তক্ষক আর কালনাগিনী
ধন্বন্তরির মহা মন্ত্রে বশ মানে জানি
সকল প্রকার সর্পবিষ আছে যার হাতে
তাকেই পূজি তারেই ধ্যানী অহরাত্র সাতে
নকুলের মাথাকাটি ছড়াই দিলাম বাণ
ধন্বন্তরির নামগান করো অবিরাম
মহাদেব কহেন হে দেবী পার্বতীরে
সর্পবিদ্যা জানা যার কে রুখিবে তারে
চাঁদ বণিকের গ্রাম বসতবাটি মোর
সাপেরে রাখি নিজ বশে বাঁধি তার ডোর।

বেজির রক্তে ভেসে যেতে লাগল সারা ঘর। ওদিকে দুর্জয় তাকিয়ে দেখতে লাগলেন প্রবল যন্ত্রণায় ছটফট করছে রূপা। প্রবল ক্রোধে হিসহিস্ শব্দে কান ফাটিয়ে দিতে চাইছে। তখন দুর্জয়ের হাতে হাবুল এগিয়ে দিল সেই সর্পদণ্ডটা। ওটার ওপরে দুর্জয় ওঝা মরা বেজিটাকে রাখলেন। এসবই সেই নাগমোহিনী বিদ্যার প্রয়োগ। বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্র বলে চলল সে। একটা একটা করে সাপ খসে পড়তে লাগল সেই অন্ধকার মূর্তিটার মাথা থেকে। আর কারও ক্ষতি করার ক্ষমতা তার নেই। সে এবার বাঁধা পড়েছে। অনেক অনেক ধ্বংসের খেলা খেলে সে বাঁধা পড়েছে।

নীল রঙের একটা তরল বেরিয়ে আসতে লাগল রূপার শরীর দিয়ে। একটা তামার পাত্র দিয়ে সেই তরলটা সংগ্রহ করল দুর্জয়। এবার তার ওপর সাতবার একটা ময়ূরের পালক পাক খাইয়ে গৌরবকে বলল, "নিন, এটা ওর মুখে ঢেলে দিন।"

যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা রূপার মুখে সেই তরল ঢেলে দিল গৌরব। আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল রূপার দেহটা। "এটা কী হল!" চিৎকার করে উঠল গৌরব।

দুর্জয় অভয় দিয়ে বলল, "নাগমোহিনী বিদ্যার প্রভাবে বিষই ঔষধে পরিণত হয়েছে। এবার ওই শরীর আর আত্মা দুটোই মিলিয়ে যাবে পরম শান্তির দুনিয়ায়।"

"রূপা কি মারা যাবে?" আবার বলে উঠল গৌরব।

"ওই ছেলেটাকে আমি কথা দিয়েছি, ওর দিদির কিছু হতে দেব না। যদি ওকে সামান্যও ভালোবাসেন একবার ওর নাম ধরে ডাকুন।"

রূপাকে কি সত্যিই ভালোবেসেছে গৌরব! নিজের ভেতরেই ঝড় উঠল যেন। পরক্ষণেই মনে হল বিয়ের দিনের কথা। একবার দেখেই মনে হয়েছিল এমন অপরূপ সুন্দরীর সাথে জন্মজন্মান্তর কাটিয়ে দেওয়া যায়। গৌরব ডাকল, "রূপা!"

রূপা গৌরবের হাতটা চেপে ধরল। সেই কালো অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল ওর শরীর থেকে।

২১

রূপা আর গৌরব একে অপরের দিকে তাকিয়ে বসেছিল অনেকক্ষণ। চোখ যেন সরাতেই ইচ্ছে করছিল না। গৌরবের কাঁধের সেই কামড়ের ক্ষতটা এখন শুকিয়ে এসেছে। মাকে এই ফ্ল্যাটে এনে রেখেছে ওরা। গৌরব জানতে পেরেছে কুয়াশা মারা যাওয়ার পরে এই ফ্ল্যাটে আরও তিনজনের মামি পক্সের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেই রাতের পরে সবাই সুস্থ হয়ে উঠেছে। কুয়াশার শরীরে ডাক্তার ঘোষাল সাপের বিষই পেয়েছিলেন। ওঁকে বিষয়টা বড্ড ভাবিয়ে তুলেছে। সাপে না কামড়েও কীভাবে সাপের বিষের সংক্রমণ মানুষের মধ্যে হয়!

রূপা কথা বলল, "তুমি আমাকে কতটা ভালোবাসো?"

হাসল গৌরব, "তোমাকে ভালোবেসে বিষকে নির্বিষ করে দিতে পারি। মৃত্যুকে দিতে পারি জীবনের স্বাদ। তোমার কোমরে হাত রেখে, ঠোঁটে ঠোঁট রেখে কাটিয়ে দিতে পারি সারা জীবন।"

লজ্জায় মাথা নিচু করে নিল রূপা। ও সব শুনেছে কাকিমার কাছে। কী ঝড়টাই না ওর ওপর দিয়ে গেছে। রূপার মনে পড়ছে সেই এগারো বছরের কথা, চরণদা ওকে জোর করে আদর করতে গেছিল। তারপর ওর আর কিছু মনে নেই। ওর প্রবল জ্বর এসেছিল। জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরে শুনেছিল চরণদা সাপের

কামড়ে মরে গেছে। তারপর মাঝে মাঝেই মনে হত ও আসলে ও নয়। আয়নায় তাকালেই দেখতে পেত একজন ভয়ংকর দর্শন মহিলাকে। মাঝে মাঝেই খুব ঘুম পেত ওর। কিছুই মনে রাখতে পারত না। শীতকাল এলেই ও নিজেকে ঘরে বন্ধ করে ফেলত। সারাদিন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকত খাটের ওপর। তবে নিজেকেই নিজে আশ্বাস দিল, এখন ও অনেক ভালো আছে।

গৌরব রূপার আর একটু কাছে ঘেঁষে এল। ঠোঁটের কাছে নামিয়ে আনল ঠোঁট। রূপা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইল ওকে লজ্জায়। গৌরব রাগ দেখিয়ে বলল, "সেদিন তো পাগল করে দিয়েছিলে। এখন লজ্জা পাচ্ছ?"

"সেদিনের আমি আর আজকের আমির মধ্যে পার্থক্য আছে মশাই।"

রূপার কথা শেষ হতেই ঝপ করে অন্ধকার হয়ে গেল। গৌরব বিরক্ত হয়ে বলল, "ধুর আবার কেবিল ফল্ট মনে হচ্ছে!" রূপা ভয়ে ভয়ে বলল, "কী অন্ধকার বাবা! আমার খুব ভয় করছে।" ওকে জড়িয়ে ধরল গৌরব।

* * * * * * * * *

অনেক টাকার একটা কাজ পেয়েছে দুর্জয় ওঝা। বর্ডারের দিকে যেতে হবে। জিনিসটা ওদের হাতে দিতে পারলে বিশ লাখ টাকা দেবে বলেছে ওরা। আর এই ওঝার জীবন ভালো লাগছে না ওর। শহরের হাওয়া গায়ে লাগতেই লোভে পড়েছে ও। টাকার লোভ!

ভাগ্যিস সেদিন ওই নীল বিষটা ও সংগ্রহ করে এনেছিল। নাগমোহিনী বিদ্যার প্রয়োগ করে এখন অনেক অনেক টাকা রোজগার করা যাবে। অলোক সামন্ত নামের লোকটা ভাগ্নি সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে আর খাতাটাও চাননি। কিছু দিয়ে পাওয়া গেছে তারচেয়ে ঢের দামী কিছু। এবার জলকেও বিষে রূপান্তরিত করা যাবে। বর্ডারের ওদিকের লোকেরা যুদ্ধ না করেও নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে যাবে সেই বিষ প্রয়োগ করে।

যে লোকটাকে জিনিসটা দিতে হবে তাকে দূর থেকে দেখতে পেল দুর্জয়। আর মাত্র একটা পাকদণ্ডি পার করতে পারলেই কাজ শেষ। তখনই হঠাৎ পায়ের দিকটা জ্বালা করে উঠল ওর। ও নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা লিকলিকে সাপ চলে যাচ্ছে পাহাড়ের ঢালের দিকে। এই সাপ ভীষণ বিষধর, আর দুস্প্রাপ্য।

মাটিতে পড়ে গেল দুর্জয়। চোখের সামনেটা ঘোলাটে হয়ে গেল ওর। মনের মধ্যে কেউ যেন বলল, নাগমোহিনী বিদ্যার অপপ্রয়োগের ফল মৃত্যুই হয়।

২২

একজন পেশেন্টকে প্রায় জোর করেই চেম্বার থেকে ঠেকে বাইরে বের করে দিল গৌরব। ওর শরীরে কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে! মনে হচ্ছে শরীরের নীচের দিকটায় কোনো সাড় নেই। কানের কাছে শুনতে পাচ্ছে হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠস্বর। যন্ত্রণা করছে পিঠের দিকে। নিজের চুলের মুঠিটা আঁকড়ে ধরল গৌরব। নাহ্, এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যেতে হবে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে যেন ওর।

গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে ফুল স্পিডে তুলে দিল গৌরব। হাসপাতাল কম্পাউন্ডে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন অবাক হয়ে দেখল সেদিকে। প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে গৌরবের। সারা শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে। কানের কাছে অনেক মানুষের কণ্ঠস্বরের মধ্যে কেউ যেন একনাগাড়ে ওকে বলে চলেছে, ওই সিলিং ফ্যানটায় তোমার মুক্তি গৌরব... ওটা থেকে ঝুলে পড়ো...

মোবাইলের স্ক্রিনে একটা অচেনা নম্বর দেখে প্রথমে ফোন তুলল না রূপা। ও এসেছে মেমারিতে। ওকে ঘিরে বেশ হইহুল্লোড় আজ বাড়ির লোকেদের মধ্যে। আবার একই নম্বর থেকে আসছে ফোনটা। রূপা দেখল পরপর পাঁচবার কেউ ওকে ফোন করেছে এই পাঁচ মিনিটে। অবশেষে ও ধরল ফোনটা।

ওপাশে অচেনা একটা গলার স্বর পাওয়া গেল। "এই তো ম্যাডাম! ওফ্, কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করে চলেছি।"

"আপনি কে বলছেন, কাকেই বা চাইছেন?" প্রশ্ন করল রূপা।

"আজ্ঞে, আমি মাধব দাস। আপনার স্বামী আমাকে চেনেন। উনি আমার মায়ের অপারেশন করেছিলেন।"

রূপা এবার খানিকটা বিরক্ত হল। "তা আমাকে ফোন করেছেন কেন? আপনি ওঁর নম্বরে ফোন করুন না।"

মাধব হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "ম্যাডাম আমি স্যারের ফোনে অনেকবার চেষ্টা করেছি। পাচ্ছি না। ওঁর খুব বিপদ ম্যাডাম। আজ চতুর্দশী। আপনাদের

ফ্ল্যাটটা ভালো না। পরপর দু'বার ওখানে সুইসাইডের ঘটনা ঘটেছে। দু-দু'জন গলায় দড়ি দিয়েছে ওই ফ্ল্যাটে। যাদবপুরের একজন আমাকে জানালেন ব্যাপারটা। আজকের এই তিথিতেই ব্যাপারটা হয় পরপর দু'বছর। ডাক্তারবাবু আমার মাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। আমারও কর্তব্য ওঁকে বাঁচানো। কিন্তু কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারছি না। আপনাদের ফ্ল্যাটেও গেছি। কিন্তু তালা দেওয়া ছিল। আজ একটা বিপদ হতে পারে।"

রূপা ফোনটা কেটে দিল দ্রুত। ওর মনে পড়ল বিয়ের পর পরই ও যেন কাউকে ঝুলতে দেখত সিলিং থেকে। তখন ওর মধ্যে অন্য কারও বাস ছিল বলেই এটা হত, এমনই মনে হয়েছিল ওর। কিন্তু এখন দেখছে ঘটনা তেমন নয়। ও পাগলের মতো ডাকতে শুরু করল বাবাকে। আজ ওকে গৌরবকে বাঁচাতেই হবে।

দেবেশ নিয়োগী দ্রুত গাড়ি বের করলেন। আর অপেক্ষা করা যাবে না। মেয়ের মুখে সবই শুনেছেন তিনি। হাবুল দিদির হাতে মা কামাক্ষ্যার মন্দিরের সেই প্রসাদী ফুলটা দিল। বলল, "একদিন গৌরবদা তোকে ফিরিয়ে এনেছিল। আজ তোর পরীক্ষা। এটা তোদের কোনো ক্ষতি হতে দেবে না।"

গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে দ্রুত মিলিয়ে গেল বড় রাস্তার দিকে। মানুষের জীবনটাই হয়তো কঠিন পরীক্ষার নিয়মে চলে। দু'দিনের সুখের পরেই আসে অনন্ত পরীক্ষার কষ্ট।

অমাবস্যা

জঙ্গলের মধ্যে একটা শব্দ হচ্ছে। কেউ পা টেনে টেনে এগিয়ে আসছে। ছপ... ছপ... একটানা হয়ে চলেছে শব্দটা। নবীন ওঝা কান খাড়া করে শুনল। শব্দের উৎস বুঝতে তার খুব একটা বেশি সময় লাগল না। গাঁজার কলকেতে একটা মোক্ষম টান দিয়ে সে গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে আসে রে?"

"বাবা আমি।"

লোকটার দিকে চোখ সরু করে চাইল নবীন। তারপর বলল, "এ শ্মশান মরে গেছে। যাহ, যাহ, দূর হ এখান থেকে। চক্ষে কিছুই দেখি না। তা তোদের মতো শেয়াল কুকুরের ভিড় লেগে থাকে। ভূত ছাড়াও, প্রেত ছাড়াও, জলপড়া দাও, তেলপড়া দাও। মর মর ওলাউঠোর বাচ্চারা।"

"আমার যে বড় অপমান হয়েছে বাবা। তুমিই তো একদিন বলতে, পুরুষ মানুষের মানটুকু বাদ দিলে আর কিছুই থাকে না। আমাকে একটু সাহায্য করবে না বাবা?"

ছানি পড়া ঘোলাটে চোখে নবীন তাকাল লোকটার দিকে। হাসল, "হে হে... তোরা হলি জাত হারামি... হে হে... সহজে আমাকে ছাড়বি না। হয়েছে কী শুনি?"

লোকটা বলতে শুরু করল, "আমার মেয়ে নীলার সঙ্গে বাগদিপাড়ার শোয়েবের যে কবে থেকে আশনাই শুরু হল আমরা কেউ টেরই পেলাম না।



আমার বউটাও কিছু বুঝতে পারেনি। আজ সকালেই মেয়ে সেই ছেলের সাথে পালিয়েছে। আমরা হলাম উঁচু ঘর। মীর মোজাফফর শোরাবুদ্দিনের নামে এখনও বাজার এলাকা কাঁপে। তিনি ছিলেন আমার বাবা। নিচু ঘরের ছেলের সাথে তারই নাতনি পালাল। এবার এ অপমান কোথায় রাখি বাবা! ওদিকে কিছু করার উপায়ও দেখছি না। সামনে ভোট। আমি আবার এই এলাকায় ভোটে দাঁড়িয়েছি। জোর করে মেয়ে তুলে নিয়ে এলেও ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। পালিয়ে যাওয়া মেয়ে তুলে আনলেও সে মেয়ের বিয়ে শাদি দিতে জান কাহিল হবে। এবার আপনিই উপায় বলে দিন।"

খ্যাঁক খ্যাঁক করে একটা বিশ্রী শব্দ ভেসে এল জোড়া কদম্ব গাছের দিকটা থেকে। মীর শোরাবুদ্দিনের ছেলে সেদিকে ভয় ভয় তাকাল কথা শেষ করে। ভয়ে ভয়ে একটা ঢোঁক গিলে বলল, "বাবা! ও কীসের শব্দ?"

নবীন হাত তুলে কিছু একটা তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলল, "যা যা। সারাক্ষণ শুধু জ্বালাচ্ছে। মেয়েছেলের নাম যেই শুনেছে অমনি এসে হাজির হয়েছে।"

তারপর স্বাভাবিকভাবে মীর শোরাবের ছেলের দিকে চেয়ে বলল, "প্রেত! এরা অনেক কামনা বাসনা নিয়ে মরেছে। হে হে। তোদের গায়ে মানুষের রক্তের গন্ধ। তোর বাপ মীর শোরাব ছিল এই প্রেতদের থেকেও খারাপ। দিনে দুপুরে মানুষ মেরে খালে-বিলে ভাসিয়ে দিত। হে হে। তা কী চাস বল? মেয়ে ঘরে ফিরে আসুক সেটা চাস নাকি হে হে..."

"মেয়ে আর চাই না বাবা। বরং এমন একটা কিছু করুন যাতে আমার ভোট বেড়ে যায়। শোকার্ত মানুষকে জনগণ ভোট বেশি দেয়।"

"শয়তান! তাই যদি চাস তাহলে জামাই মেয়েকে ঘরে তুলে নে। ওদের ক্ষতি চাস কেন? আমার কাছে মানুষ আসে ক্ষতি করার জন্য।"

মেহেরাব তারা ভরা আকাশের দিকে চেয়ে বলল, "আমার আত্মায় লেগেছে বাবা! যাকে বুকে করে আগলে রাখলাম সে-ই কিনা আমায় দাগা দিল! দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো।"

নবীন চোখ বুজে শুধু বলল, "তুই ঘরে যা, কাজ হয়ে যাবে।"

"তাহলে আসি বাবা। তুমি কিছু চিন্তা কোরো না। কাজ হলে যা চাইবে তাই পাবে।" মেহেরাব চেয়ে থাকল নবীনের দিকে।

আর কথা বলল না নবীন। তাকে ওভাবে চুপ করে বসে থাকতে দেখে ভয়ে আর কথা বলতে পারল না মীর শোরাবের ছেলে মেহেরাব। সে আবার পা টেনে টেনে ফিরতে লাগল জঙ্গলে রাস্তা ধরে। জঙ্গলের মধ্যে একটা ঠান্ডা হাওয়া ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। নানারকমের শব্দ শোনা যাচ্ছে। যে শব্দ শুনলে সাহসী মানুষেরও বুক কেঁপে ওঠে। মীর মেহেরাব মনে মনে ভাবল এই নবীন ওঝা এখানে একলা থাকে কী করে! অবশ্য যে লোক ভূত পিশাচের সাথে থাকতেই ভালোবাসে তার আর কীসের ভয়। দাঁতে দাঁত পিষল সে। এত আদর যত্নে যে মেয়েকে সে বড় করল, সে-ই কিনা বংশের মান ঢুবিয়ে দিল! ওই মেয়ের মরে যাওয়াই ভালো। সম্মানের আগে কিচ্ছু নেই।

২

বিদ্যেধরীর মন্দিরে আজ অনেক লোকের ভিড়। মেলা বসে গেছে। আজ ফলহারিণী কালীপুজো। মায়ের কাছে হাজার হাজার মানুষ আসে ফলের আশায়। তারা মানত করে। ঢিল বেঁধে রেখে যায় প্রাচীন বটতলায়। পীর সাধুরা লেপে দেয় মুঠো মুঠো সিঁদুর বটের খড়খড়ে শরীরে।

নীলা আর শোয়েব হাত ধরাধরি করে এসে দাঁড়াল মেলার মাঠে। নীলা এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে। বাবা তার দলবল নিয়ে ওদের কোনো ক্ষতি করতে আসেনি। আসলে মেয়েকে বাবা বড় ভালোবাসে। ক্ষমা করে দিয়েছে বোধহয়। শোয়েবকে ও বলেছিল, "দেখিস, বাবা ভোটে জিতে গেলে আমি ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই উনি কেমন গলে পানি হয়ে যান।"

"মীর মেহেরাব এত সহজে সব মেনে নিলেন! ব্যাপারটা ঠিক ভালো ঠেকছে না বুঝলি।" শোয়েব পাল্টা বলেছিল নীলাকে।

"আব্বা আমাকে ভালোবাসেন রে। হাজার রাগ হলেও রাগ ঠিক পড়ে যাবে দেখিস।"

‘"জিলিপি খাবি?"

শোয়েবের প্রশ্নে উজ্জ্বল হয়ে উঠল নীলার মুখ। খিদে তার অনেকক্ষণ ধরেই পেয়েছে। সারাদিনে কম ধকল তো গেল না। কাজির অফিস এখান থেকে

দশ কিলোমিটার দূরে। সারাটা পথ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া। এই বুঝি আব্বা দলবল নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই বুঝি রহিম মামা ছোরা দিয়ে পেট ফাঁক করে দিল তার স্বামীর। তেমন কিছুই হয়নি। যেটা হয়েছে সেটা হল, চিন্তা আর শাদির দৌড়ঝাঁপে খাওয়া হয়নি।

মিষ্টি হেসে নীলা বলল, "নিয়ে আয়। আর একটা কথা মনে রাখিস, কাল থেকে কিন্তু জোর কদমে পড়াশোনা করতে হবে। কাল থেকে ঘোরাঘুরি বন্ধ।"

শোয়েব হাত জোড় করে বলল, "যো হুকুম মেরি বেগম।"

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠল দু'জনে। ওদের জীবনে এখন ভরা পূর্ণিমা। তার আলোও ওরা ভেসে যেতে চাইছে। আজ যে অমাবস্যা, তার কোনো প্রভাবই পড়ছে না ওদের ওপর। একটা বুড়ো বাবলা গাছের নিচে নীলাকে দাঁড় করিয়ে রেখে শোয়েব জিলিপি আনতে গেল। দোকানের সামনে খুব ভিড়। নীলা যেতে চাইল না ওর সাথে।

কাঠের নাগর দোলায় দুলছে কচিকাঁচারা। একদল নারী-পুরুষ ভিড় করে এগিয়ে যাচ্ছে মন্দিরের দিকে। সবার হাতে সন্দেশের ডালা। বড় বড় জবার মালা তিন প্যাঁচ করে রাখা আছে ডালার ওপর। নকল বন্দুক নিয়ে রঙ বেরঙের বেলুন সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। সে কমবয়েসি ছেলেদের হাত নেড়ে নেড়ে ডাকছে। হাজার মজার জায়গা এই মেলা। সব দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল নীলা। মা বিদ্যেধরীর মন্দিরে সবাইকে ঢুকতে দেওয়া হয়। যিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি ছিলেন বড় তান্ত্রিক। তিনি বলতেন তন্ত্র আর তান্ত্রিক সমস্ত জাতপাতের ওপরে। না তন্ত্রের কোনো জাত আছে না তান্ত্রিকের।

"এই নীলা, এই!"

নীলা চমকে উঠল। ও ঠিক শুনল তো! দাদি ডাকল মনে হল। অবিকল দাদির গলা। এই পৃথিবীতে ওকে যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে সে হল ওর দাদি। নাতনি পালিয়েছে তাই বুড়িরও বোধহয় খুব মন খারাপ ছিল। বুড়ি ঠিক খুঁজে খুঁজে এখানে চলে এসেছে।

ডাকটা ভেসে এসেছে নীলার পেছন দিক থেকে। ও পেছন ফিরে তাকাল। আশ্চর্যের ব্যাপার! মেলার এত হইচই এত হট্টগোল যেন বাবলা গাছের পেছন দিকের নিস্তব্ধতাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। ভীষণ চুপচাপ আর অন্ধকার

এই জায়গাটা। মেলার মাঠের আলো যেন ওই বাবলা গাছ অবধি এসেই থেমে গেছে। এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নীলা আগে কখনও দেখেনি। বাবলা গাছ পার করে সে কয়েক পা এগিয়ে গেল অন্ধকারের দিকে। জায়গাটা জঙ্গুলে। কড়কড় কড়কড়... একটা চাপা শব্দ জঙ্গলের একদিক থেকে অন্যদিকে ভেসে গেল।

ভয় পেল নীলা। সে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কে, দাদি নাকি?"

আবার শোনা গেল সেই কড়কড়ে শব্দটা। গা-টা কেমন যেন ছমছম করে উঠল নীলার। আর এগোনোটা ঠিক হবে কি না সে বুঝতে পারল না। ফিরে যাওয়াই ভালো। ওদিকে শোয়েব হয়তো জিলিপি নিয়ে ফিরে এসেছে এতক্ষণে। ফিরে আসার জন্য নীলা পেছন ফিরতেই আবার শোনা গেল, "এই নীলা, এই!"

নীলা আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। দাদি কি তার সাথে মশকরা করছে! ছেলেবেলায় এটা ছিল দাদি আর তার প্রিয় খেলা। একজন অন্যজনের নাম ধরে ডেকে লুকিয়ে পড়তে হবে। তারপর খোঁজো।

আবার নীলা এগিয়ে গেল অন্ধকার জঙ্গলটার দিকে। চেঁচিয়ে উঠল, "এই বুড়ি! আমার সাথে মজা করবে না। বেরিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো বলছি।"

সাথে সাথেই একটা বিশ্রী হাসির শব্দে জঙ্গলটা কেঁপে উঠল। হি হি হি হি হি...

"এই নীলা, এই নীলা, এই নীলা!"

এইবার আর এগোনোর সাহস পেল না নীলা। যে গলাটা সে শুনেছে সেটা কখনোই তার দাদির হতে পারে না। তাছাড়া দাদি তো বছর দুয়েক হল খাট থেকেই নামতে পারে না বাতে পঙ্গু হয়ে গিয়ে। তার মন বলল এই ডাকে সাড়া দিও না। বিপদ হবে, খুব বড় বিপদ হবে। কিন্তু ঠোঁট নড়ে উঠল, "কে, কে ডাকছে আমাকে?" গলা চিরে বেরিয়ে এল মাত্র চারটে শব্দ।

সাথে সাথেই মাটিতে ধপ করে পড়ে গেল নীলা। শোয়েব তাকে মেলার মাঠে অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও পেল না। মেয়েটাকে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিল সেখানে তো মেয়েটা নেই! তবে গেল কোথায়! দুশ্চিন্তাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ওর। মেয়েটাকে ওর বাবার লোকজনেরা তুলে নিয়ে যায়নি তো!

মেলা থেকে একটু সরে এসে একটা গাছতলায় বসে পড়ল শোয়েব। মেলা

ভাঙার অপেক্ষা করতে লাগল। ভিড় কমলে তখন নয় এদিক ওদিক দেখা যাবে। দেখতে দেখতে এক সময়ে মেলা ভেঙেও গেল। শোয়েবের কী যেন মনে হল, ও ঢুকল জঙ্গলের দিকে। কিছুক্ষণ এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা বুনো ঝোপের পাশে। সে যে দৃশ্যটা দেখল সেটা তার শরীরটাকে জল করে দিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে ঘেমেনেয়ে উঠল শোয়েব।

শোয়েব দেখল নীলা মাটিতে পড়ে আছে, কেউ তার কাপড়জামা খুলে নিয়েছে। মেয়েটার ঠোঁটের কষ থেকে গড়িয়ে পড়ছে ফ্যানা। তিনটে শেয়াল ওকে ঘিরে চক্রাকারে ঘুরছে। সুযোগ খুঁজছে! মাংসের লোভে শেয়ালগুলোর লালা গড়িয়ে পড়ছে। এই মরাখেকোগুলো তো শ্মশানের মড়ার লোভে আসে! তাহলে! ধ্বক করে উঠল শোয়েবের বুকের ভেতরটা।

ভাগ্যিস পকেটে একটা দেশলাইয়ের বাক্স ছিল। মেলায় কেনা খাবারগুলো যে কাগজে মোড়ানো ছিল, খাবারগুলো ফেলে সেই কাগজগুলো একসাথে জ্বালিয়ে দিল শোয়েব। আগুন দেখে শেয়ালগুলো পিছিয়ে যেতেই লাফিয়ে নীলার সামনে চলে গেল ও। নিজের পাঞ্জাবিটা খুলে ওর বউয়ের আব্রু ঢাকল শোয়েব। বুকে হাত দিয়ে দেখল, নাহ্ প্রাণ আছে! বউয়ের শরীরটা কোনো রকমে কোলে তুলে নিয়ে ছুটল বাড়ির দিকে।

৩

"নবীন ওঝার মোক্ষম মার কখনো খালি যায় না। ও তোমার মেয়ের পেছনে পিশাচ লেলিয়েছে!" হাসান মাথা নিচু করে বলল কথাগুলো।

মীর মেহেরাবকে কিছুটা চিন্তিত দেখাল। কিন্তু সেটা সে প্রকাশ করল না। এখন শক্ত থাকার সময়। কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলেই সে নবীনের কাছে ছুটে গেছিল। পরিণতি যে ভয়ংকর হবে এটা সে জানতই। সে শুধু চাপা গলায় হাসানকে উদ্দেশ্য করে বলল, "এসব কথা নীলার মা বা দাদিকে বলবি না। ওরা শুনলে ঝামেলা বাঁধবে। তুই বরং রহিমকে একবার ডাক।"

হাসান আর দেরি না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বাড়ি থেকে অদূরেই রহিমের একটা ফার্ম আছে। হাঁস, মুরগি, ছাগল এসব পোষা হয়। দরকারে

সাপ্লাইও করা হয়। আজ বোধহয় কোথাও থেকে অর্ডার এসেছে। হাসান ফার্মে ঢুকেই দেখল রহিম পায়ের তলায় চেপে ধরছে এক একটা মুরগি আর চপারের পোচে নামিয়ে দিচ্ছে গলা, তার পরেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সেটা ছুড়ে দিচ্ছে ওর সহকারী রেহানের দিকে। রেহান সেগুলোর যত্ন করে ছাল ছাড়াচ্ছে।

"এই রহিম, তোকে মেহের মিয়া ডাকছে।"

হাসানের কথা কানে যেতেই মাথা তুলে তাকাল রহিম। ওর পায়ের নিচে থরথর করে কাঁপছে একটা গলাকাটা মুরগি। রহিম বিরক্ত হল কিছুটা। আজকাল আর ওর মেহেরাবের কাজ করতে ভালো লাগে না। একসময়ে দু'জন খুব বন্ধু ছিল। এখন ঠিক ওরা শত্রু নয়, তবে মেহেরাবকে পশু মনে করে রহিম। ওদের পরিবারের ওপর শোহরাবুদ্দিনের দয়া না থাকলে আজ নির্ঘাত ও বলত, হাসান যেন ফিরে যায়। বলল না। চপারটা মাটিতে নামিয়ে রেখে রহিম রেহানকে বলল, "বাকি মালগুলো কাট, আমি পাঁচ মিনিটে আসছি।" তারপর বেরিয়ে এল হাসানের সাথে।

রহিম মেহেরাবের ঘরে ঢুকে দেখল ও মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। নিশ্চয়ই কোনো চিন্তায় আছে ওর ছেলেবেলার বন্ধু, বচপন কা দোস্ত!

"কী হয়েছে?" ক্ষীণ গলায় রহিম জিগ্যেস করল।

"দোস্ত, তোকে আমার মেয়ে মামা বলে। চাচা বলে না। ওর মা আর দাদির পরে ও তোকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। সেই মেয়েকে নিয়েই করিম মোল্লার বাচ্চা শোয়েব আজ ভেগে গেছে। তোকে এর শোধ নিতে হবে।"

"বেটি কি ওকে ভালোবাসত?" পালটা প্রশ্ন করল রহিম।

"এইটুকু মেয়ে দুনিয়াদারির কী বোঝে রে রহিম? পেয়ার, মোহাব্বত, ভালোবাসা এসব সাময়িক জিনিস। সব বেমানান এই দুনিয়ায়। ওই ছেলে ওর ওপর জাদু করেছে। তুই তো জানিস দোস্ত, করিম জাদুটোনা শিখত এক ফকিরের কাছে। ছেলেকেও বোধহয় বড়লোকের মেয়ে ভাগানোর জন্য সেই জাদু শিখিয়ে দিয়েছে। সেই জাদুই ও করেছে আমাদের বেটির ওপর। দোস্ত আমার মাথায় হাত রেখে কথা দে, বেটির ওপর তুই নজর রাখবি? যদি দেখিস সত্যিই জাদু করা হয়েছে তুই ওই করিম আর ওর ব্যাটার জান নিয়ে ফিরবি!"

বন্ধুর মুখে এতগুলো কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল রহিম।

কী বলবে বুঝতে পারল না। ওর মনে পড়তে লাগল নীলার ছোটবেলার কথা। নীলার জন্য ও একদিন ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়ে গেছিল। শ্রাবণের মেলা হলেই নদীর পাড়ে মেলা বসত, আর সেখানে আসত দুনিয়ার গরু আর ষাঁড়। বেচা কেনা চলত সারাদিন ধরে। সেই মেলাতেই একবার ও আর মেহেরাবের পরিবার গেছিল। আর একটা পাগলা ষাঁড় ক্ষেপে গিয়ে একে ওকে আক্রমণ করছিল। একা পড়ে গেছিল নীলা। সে তখন কাঠের ঘোড়ার দোলনায় দুলছে। তখনই ষাঁড়টা এগিয়ে এসেছিল সেদিকে। সবাই পালিয়েছিল। মেয়েটা অসহায়ের মতো চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। আর সেই ষাঁড়ের সামনে লাফিয়ে পড়েছিল রহিম। ষাঁড়টার শিং ধরে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ষাঁড়টাও দমে যায়নি, মাথাটা ঘুরিয়ে একটা শিং রহিমের পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ষাঁড়টার মালিক সেই মুহূর্তেই ছুটে এসে দুটো ঘা দিয়েছিল প্রাণীটাকে। তারপর সব শান্ত হয়ে গেছিল। তবে রহিমের পেট থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছিল না। মেহেরাব ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিল। মীর শোহরাবের প্রতিষ্ঠিত সেই হাসপাতালে মেহেরাবের কথাই ছিল শেষ কথা। সে যাত্রা বেঁচে গেছিল রহিম। আজ জীবন তাকে ঋণ শোধ করতে বলছে। সে উত্তর দিল, "আমি নজর রাখব দোস্ত, যদি ওরা সত্যিই আমার বেটির ক্ষতি করে থাকে, একটাকেও বাঁচিয়ে রাখব না।"

পেটের কাছে ক্ষতটায় একবার হাত বোলাল রহিম। আজও শিঙের আঘাতের দাগটা মিলিয়ে যায়নি। জান থাকতে ও নীলার কোনো ক্ষতি হতে দেবে না। মেহেরাবকে কিছু না বলেই তারপরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আকাশের গায়ে রংমশালের খেলা লেগেছে। রাতের দিকে একটা ঝড়-বৃষ্টি হবে। জোরে পা চালাতে লাগল রহিম। করিম লোকটাকে ও চেনে। টাকার জন্য একসময়ে অনেক খারাপ কাজ করতে লোকটা। তার ছেলেকেই শেষে নীলার মনে ধরল! বিষয়টা ভাবাচ্ছে ভীষণ রহিমকে। এরমধ্যে সত্যিই যদি করিমের কোনো চাল থাকে তাহলে তারই ভিটের মাটি ছ'ফুট খুঁড়ে তাকে পুঁতে দিয়ে আসবে রহিম। খালি হাতে এসেছে, সেটা কোনো ব্যাপারই নয়। খালি হাতেই বহু মানুষ মেরেছে রহিম। মীর শোহরাব যখন আদেশ দিতেন ও অন্ধের মতোই সেই আদেশ পালন করত। দেশের আইন বদলাল, নিয়মকানুন এখন অন্যরকম। তাই বাপের পথে হাঁটছে না মীরের ছেলে। সে জনদরদী নেতা হয়েছে। সবই আসলে সেই

ক্ষমতা কায়েম করারই অছিলা।

দূর থেকে একবার করিমের বাড়িটা দেখল রহিম। কোনো আলো জ্বলছে না। অন্ধকারে পথও দেখা যাচ্ছে না ভালো করে। সাথে আলোটা না আনা ভুল হয়েছে। বিদ্যুতের চমকের তালে তালে পথ চিনে এগিয়ে যেতে লাগল রহিম। করিম একেবারে গ্রামের শেষে থাকে। একটা খুব খারাপ কাজ করার জন্য ওকে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

করিম জাদুটোনা জানত, সেই বিদ্যার প্রয়োগও করত প্রয়োজনে। একবার এক চাষার জমিতে কিছুতেই ফসল হচ্ছিল না। সেই দুঃখী চাষা করিমের পায়ে এসে পড়ে, যদি তুক-গুণ করে কিছু ফল হয়! করিম তাকে দিয়েছিল সাংঘাতিক এক বিধান। চাষা সেইমতো কাজও করেছিল। তারপরেই গ্রামের মাটিতে জ্বলে উঠেছিল আগুন। চাষা নিজের মা-কে মেরে ফেলেছিল! এই অপরাধে তার ঘর পুড়িয়ে দেয় গ্রামের সকলে। সে পোড়া ঘরের সামনে বসে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, এই কাজ নাকি করিম তাকে করতে বলেছে। চাষার ছিল অভাবের সংসার। তার ওপর মহাজনদের নিত্য তাগাদা ছিল ফসল কেনার টাকা সুদে আসলে তাড়াতাড়ি ফেরত দিতে হবে। চাষার কষ্টের মধ্যে বুদ্ধিভ্রম হয়েছিল। সকলে যখন তাকে চেপে ধরে এবং জিগ্যেস করে করিম তাকে কী বিধান দিয়েছে? তখন সে স্বীকার করে, করিম তাকে বলেছে মাটি হল মা। মায়ের শরীরে যেমন সন্তানরূপী ফল ধরে তেমনই মাটির বুকে আসে ফসল। মাটি যখন নিজের মাতৃত্ব হারায় নিজের মাকেই তার কাছে অর্পণ করতে হয়। নিজের মায়ের কলজে পোড়া ছাই যদি মাটিতে মিশিয়ে দেয়া যায় তবেই নাকি হবে অসাধ্য সাধন। এই জন্যই চাষা নিজের মা-কে হত্যা করে পোড়াতে গেছিল। অথচ ধর্মমতে তাকে কবর দেওয়ার কথা। এতেই সন্দেহ হয় গ্রামবাসীর।

করিমের বাড়ির একেবারে কাছাকাছি চলে এল রহিম। অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়েছে। মৃদু হাওয়ায় দুলছে শুধু বাড়ির আশেপাশের গাছগুলো। তাদেরও ঠিক চোখে দেখা যাচ্ছে না। শব্দ শুনে যেটুকু ঠাহর করা যায়।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল রহিম। যদি ভেতরে তার নীলার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সেটুকু কানে এলেই ও বুঝতে পারবে ওর বেটি কেমন আছে! দরজার কাছে দাঁড়িয়েও রহিমের মনে হল ভেতরে কেউ নেই। এত নিস্তব্ধ কেন! অথচ

দিন কয়েক আগেও যখন এখান থেকে ও বাড়ি ফিরছিল করিমের ঘরে আলো জ্বলছিল, ছেঁড়া ছেঁড়া কথা শোনা যাচ্ছিল করিম আর ওর বউয়ের।

সাহস করে দরজায় হালকা একটা ঠেলা দিল রহিম। যদিও ওর সাহসের দরকার পড়ে না। ওর নাম শুনলেই এই গ্রামের সকলে মাথা নিচু করে চলে যায়। দরজাটা খুলে যেতেই অবাক হল রহিম। ঘরের মধ্যে আলকাতরা ঢেলে রেখেছে যেন কেউ। ও গলা তুলে শব্দ করল, “করিম আছিস নাকি? এই নীলা, নীলা আমি মামা!”

উত্তর পাওয়া গেল না। বাইরে বৃষ্টি নামল তখনই। আর একটা শব্দ করে বাজ পড়ল সাথে সাথে। বিজলির আলোয় ঘরের যতটুকু দেখা গেল সবটাই ফাঁকা। এরা কি তাহলে পালিয়েছে সবাই মিলে! মীর মেহেরাবের মেয়েকে তুলে এনে বিয়ে করেছে করিমের ছেলে সেই ভয়েই কি সবাই ভেগে গেছে! কথাটা মাথায় এল রহিমে। বিদ্যুতের ওই আলোতে একটা কাজের জিনিস দেখতে পেয়েছে রহিম। ওর পাশেই একটা তাকে রাখা আছে একটা দেশলাইয়ের বাক্স। সেটা অন্ধকারের মধ্যে হাতে তুলে নিল ও। হাওয়া আড়াল করে খুব সাবধানে সেটা জ্বালিয়ে পাশের ঘরে এগিয়ে গেল। সেই ঘরে ঢুকে অতি সাহসী রহিমেরও ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। ও পেছন ঘুরে দৌড়ে বেরিয়ে এল বাইরে। এই ঘরে আর কিছুক্ষণ থাকলেই বিপদ হবে। যে অপরাধ ও করেনি তারই বোঝা ওর ঘাড়ে এসে চাপবে।

অন্ধকার জঙ্গুলে পথ দিয়ে অনেকটা দৌড়ে এসে একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে রহিম হাঁফাতে লাগল। এই অন্ধকারে অনেকবার দৌড়তে গিয়ে ও হোঁচট খেয়েছে। একবার পড়েও গেছে। পায়ের কাছে নিশ্চয়ই কোথাও কাঁচা ছাল উঠে গেছে। না হলে এত জ্বালা করার কথা না। গাছের তলায় বসে ও ভাবতে লাগল ঘরের মধ্যে কী দেখেছে! ঘরের মধ্যে একটা চৌকি ছিল আর ঠিক তার পাশেই মাটিতে পড়েছিল একটা নিথর শরীর। করিমের বউয়ের প্রাণহীন দেহ! শরীরটা সোজা হয়ে পড়েছিল আর মাথাটা ছিল উল্টোদিকে ঘোরানো। কে অমনভাবে মারল ওকে!

৪

বাপের সংসার থেকে অনেকদিন আগেই বেরিয়ে এসেছে শোয়েব। লোকটা ওর পড়ালেখা বন্ধ করিয়ে দিয়েছিল অনেক আগেই। অথচ ও পড়তে চেয়েছিল। নীলার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে নতুন একটা জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল। কোনো রকমে এর ওর বাড়িতে রাত কেটে যাচ্ছিল। চালের গোলায় বা ডালের মিলে শুয়ে দিন পার হয়ে যাচ্ছিল। মাঝে এসে পড়ল নীলা। একটা মেয়েকে তো আর বিয়ে করে ডালের মিলে নিয়ে তোলা যায় না। তাই দর্জিপাড়ায় রহমান দর্জির একতলার একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে ও নতুন বউকে এনে রাখবে বলে। এই ঘরটা বড় সুন্দর করে সাজিয়েছিল শোয়েব। অথচ এখন বিয়ের প্রথম দিনে যেন ওর জীবনে সত্যিই অমাবস্যার আঁধার নেমে এসেছে!

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে নীলার। থেকে থেকেই মৃগীরোগীর মতো কেমন যেন হাত পা বেঁকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো শরীর একেবারেই স্থির হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে প্রাণ নেই। ডাক্তার ডাকা হয়েছিল। তিনি ইঞ্জেকশন দিয়ে গেছেন। বলেছেন অনেকদিন পর এপিলেপ্টিক অ্যাটাক হয়েছে, আজ রাতটা সাবধানে রাখতে হবে। অথচ এই তিন বছরে শোয়েব কখনো নীলার মুখে শোনেনি ওর মৃগী আছে!

নীলার পাশে বসে ওর মাথায় জলপট্টি দিতে লাগল শোয়েব। মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগল। নীলা জ্বরের ঘোরে কিছু একটা বিড়বিড় করে যাচ্ছে। শোনার চেষ্টা করল শোয়েব। কিছুই বুঝতে পারল না। কারও সাথে যেন ঝগড়া করছে মেয়েটা। শোয়েবের এক সময়ে ঘুম এসে গেল। ও ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন শোয়েবের ঘুম ভাঙল তখন দেখল পুব দিকের জানালা দিয়ে একফালি ধূসর মেঘলা আকাশ দেখা যাচ্ছে। নীলা ওর খাটে নেই। শোয়েবের চিন্তা হল। ও দৌড়ে ঘর থেকে বেরোতেই দেখতে পেল নীলা একটা আকাশি রঙের শাড়ি পরে হাতে দু'কাপ চা নিয়ে এগিয়ে আসছে। ওকে বেশ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে।

শোয়েব জিগ্যেস করল, "শরীর এখন কেমন আছে নীলা?"

"আমার কী হয়েছিল গো?" নীলা পালটা প্রশ্ন করল। প্রশ্নটা কিছুটা অবাক করল শোয়েবকে। মেয়েটার কিছুই মনে নেই!

"তোমার কাল রাতে খুব জ্বর এসেছিল। কেমন যেন শক্ত হয়ে বেঁকে যাচ্ছিলে জ্বরের মধ্যে। ডাক্তারবাবুকে ডাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। তিনি এসে বললেন এপিলেপ্টিক অ্যাটাক না কী যেন একটা রোগ থেকে সমস্যা হয়েছে।"

শোয়েবের কথা শুনে নীলা কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। তার পর ঢোঁক গিলে বলল, "এপিলেপ্সি, মানে মৃগী! আমার তো এই রোগ ছিল না কখনো!"

"ডাক্তার কিন্তু বললেন এ রোগ পুরোনো এবং অনেকদিন পরে আবার ফিরে এসেছে।"

কথা না বাড়িয়ে নীলা চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল শোয়েবের দিকে। এই বিষয়টা নিয়ে ঝগড়া করাই যেত কিন্তু ওর এই মুহূর্তে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করল না। খুব শীতল গলায় শুধু একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিল ও শোয়েবের দিকে, "আচ্ছা, এটা যদি পুরোনো রোগও হয়ে থাকে তবে কি তুমি আমায় ছেড়ে দেবে?"

শোয়েব একটা ধাক্কা মতো খেল। ওর এভাবে নীলার সঙ্গে কথা বলা ঠিক হয়নি। নিজেকে আরও সংযত করা উচিত সংসার করতে হলে। এখন আর ওর জীবন বাউন্ডুলে ধরনের নেই। তাছাড়া নীলাও তো ওর জন্য নিজের আরামের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে! কোথায় একটা নেতার মেয়ে আর কোথায় এক গ্রাম থেকে বিতাড়িত পরিবারের ছেলে!

শোয়েব কথা ঘুরিয়ে বলল, "ক্লাস এইট থেকে আবার পড়া শুরু করব, তোমার জন্যই আবার পড়া শুরু করার সুযোগ পাচ্ছি নীলা। বিরেন মাস্টার বলেছেন আমি বাড়িতে পড়েই পরীক্ষা দিতে পারব। তুমি শুধু আমাকে একটু পড়াটা দেখিয়ে দিও।"

শোয়েব পড়তে চাইছে শুনে নীলার মনটা ভালো হয়ে গেল। এক নিমেষেই সব রাগ জল হয়ে গেল। ও বলল, "দেখি বইগুলো নিয়ে এসো। খাতা থাকলে সেগুলোও আনবে।"

শোয়েব বই আনতে চলে যেতেই নীলার মাথায় আবার এসে ধাক্কা মারল কথাটা। একটু আগেই যেটা শোয়েব বলেছে, ডাক্তারবাবু যেটা বলে গেছেন! ওর কি কখনো মৃগী রোগ ছিল! মনে করার চেষ্টা করল। নাহ্, হতেই পারে না। যদি থাকত সহজেই মনে পড়ত। কারণ এটা তো আর জ্বর বা সর্দির মতো সামান্য

রোগ নয়। নার্ভের অসুখ! অনেক ছোটবেলার কথা নীলা মনে করতে পারল না। সে সময় যদি থেকে থাকে তাহলে আলাদা কথা।

শোয়েব বইখাতা নিয়ে নীলার সামনে এসে বসে পড়ল। তারপর বলল, "নীলা, আমাকে আজ তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। ডালের মিলে কাজ আছে। দুপুরের মধ্যে ফিরে আসব। খাবার নিয়ে আসব ইসমাইল কাকার হোটেল থেকে। কাল থেকে এখানে রান্নাবান্না করলেই হল। তোমাকে হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হবে না। তোমার তো আর কয়েক মাস পরেই বারো ক্লাসের ফাইনাল, তুমি মন দিয়ে পড়ো। আমি সকালে রান্না করে রেখে দেব।"

নীলা হেসে শোয়েবের চুলের ঝুঁটিটা নাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমি রান্না করতেও পারি না।"

"তা হলে তো বিয়ে শাদি করা ঠিক হল না!" বোকা বোকা মুখ করে বলল শোয়েব।

এই কথা শুনে নীলা হেসে ফেলল। হাসল শোয়েবও। অংক বইয়ের একটা অধ্যায় খুলে নীলা শোয়েবের সামনে মেলে ধরে বলল, "আজ অংক করা যাক।"

সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে ছুটে এসে একজন ঘরে ঢুকল। নীলা লোকটাকে চেনে না। সে লোকটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। লোকটা দারুণ হাঁফাচ্ছে। অনেকটা পথ দৌড়ে এসেছে সম্ভবত।

শোয়েব লোকটাকে জিগ্যেস করল, "কী হয়েছে রহমান চাচা, কোথা থেকে এমন দৌড়ে দৌড়ে আসছ?"

রহমান হাঁফাতে হাঁফাতেই বলল, "তোর মা-কে কাল কেউ তোদের ওই বাড়িতে মেরে রেখে দিয়ে গেছে। উড়ালপুর থানার পুলিশ এসেছে সেখানে। আমি দেখেছি। সে কী ভয়ংকর দৃশ্য। ঘাড়টা যেন কেউ উল্টোদিকে মুড়ে দিয়েছে!"

দু'হাতে মুখ চেপে কেঁদে ফেলল শোয়েব। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, "আমি জানতাম... আমি জানতাম... ওই লোকটার সাথে থাকলে এই পরিণতি হবে আমার মায়ের। কতবার বলেছিলাম আমার কাছে চলে এসো। লোকটাকে ছেড়ে এল না।"

"মন শক্ত কর শোয়েব। চল আমার সাথে। পুলিশ তোকে খুঁজছে। আমি বললাম তুই এখন আমার ঘরে ভাড়া থাকিস, তাই তোকে সাথে নিয়ে যেতে বলল

পুলিশ।” রহমান বলল।

“আমি যাব?” জিজ্ঞেস করল নীলা।

শোয়েব নীলার মাথায় হাত রেখে নিজের চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, “তোমাকে যেতে হবে না। তোমার শরীরটা ভালো নেই। আমি গিয়ে দেখি কী হয়েছে!”

রহমান আর শোয়েব বেরিয়ে গেল। নীলা একা হয়ে গেল একেবারে। ওর আবার মন খারাপ হয়ে গেল। সদ্য কালই বিয়ে হল ওদের আর কাল রাতেই কিনা ওর শাশুড়িকে কেউ মেরে রেখে চলে গেছে। একটা দুর্ভাবনায় ওর সারা শরীরে আবার আতঙ্কের ছাপ পড়ল। ওর বাবার কোনো লোকের কাজ না তো এটা!

বেলা পড়ে আসছে। কাল থেকে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তা এখনও থামেনি। বিশ্রী একটা একঘেয়ে টিপটিপে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে আবার যেন সব অন্ধকার হয়ে এল। জোরে বৃষ্টি আসবে। নীলা খাটে শুয়েছিল। ওর খিদে পাচ্ছে। কিন্তু ঘরে খাবার কিছুই নেই।

তখনই ঝেঁপে বৃষ্টি এল। পূর্ব দিকের জানালাগুলো দিয়ে হু হু করে ছাঁট আসতে লাগল। নীলা উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করতেই যাবে হঠাৎ ওর মনে হল পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। পচা একটা গন্ধে ঘর ভরে উঠেছে। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল নীলার। জানলা আর বন্ধ করতে পারল না। বৃষ্টির ছাঁটে একটু একটু করে ভিজতে লাগল ওর সারা শরীর।

একটা পচাগলা হাত নীলার কাঁধ স্পর্শ করল। সেই হাত থেকে যেন চামড়া খসে পড়ছে! কেউ যেন ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, “নীলা!”

সেই গলার স্বর যেন কোনো মানুষের হতে পারে না। নরকের পাঁক থেকে পাক খেতে খেতে উঠে আসছে সেই স্বর। নীলার চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

৫

থানা থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হল শোয়েবের। তার মায়ের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে শহরের মর্গে। আজ আর মৃতদেহ ছাড়েনি পুলিশ থেকে। কবে ছাড়া হবে তাও পরিষ্কার করে জানায়নি। খোঁজ নিতে বলেছে শুধু। পুলিশের

অনুমান তার মা-কে খুন করা হয়েছে। ভয়ংকর আক্রোশে কেউ মাথাটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে মহিলার। প্রাথমিকভাবে পুলিশ শোয়েবের বাবা করিমকেই সন্দেহ করেছিল। পরে একজন বলেছে রহিম কসাইকে নাকি এই বাড়ির থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে কাল রাতে। রহিম কসাই কেন শোয়েবের মা-কে মারতে যাবে! এই কথাটা অনেকবার ভেবেছে শোয়েব। একটু ভাবার পরেই উত্তর পেয়েছে সে। রহিম তো নীলার বাবা মীর মেহেরাবের খাস লোক। মীরের কথায় লোকটা অনেকবার খুন করেছে। নীলাকে বিয়ে করে কোনো ভুল করল না তো!

শোয়েব বেখেয়ালে একটা হোঁচট খেল ঘরে ঢুকতে গিয়ে। ঘর অন্ধকার। আর মাটিতে এটা কী পড়ে আছে! হোঁচট খাওয়ার সাথে সাথেই প্রশ্নটা মাথায় এল ওর। জিনিসটা কী, সেটা বোঝার সাথে সাথেই ভয়ে পেটের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল শোয়েবের। এ তো নীলা! চৌকাঠে শুয়ে আছে কেন!

নীলার গায়ে হাত দিয়ে আঁতকে উঠল শোয়েব আবার সেই ধুম জ্বর। হাত-পাগুলো বেঁকে রয়েছে নীলার। শোয়েব কোলে তুলে নিল নীলার অসাড় শরীরটা। চৌকিতে শোয়াল ওকে। তারপর ঘরের আলোটা জ্বেলে আরও ভয় পেয়ে গেল শোয়েব। সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে নীলা। শরীরে যেন এতটুকুও রক্ত নেই।

"নীলা!" ডাকল শোয়েব।

কোনো উত্তর পেল না। জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে মেয়েটা। বিড়বিড় কী যেন একটা বলে চলেছে। একটাই কথা বারবার আওড়ে যাচ্ছে। শোয়েব ভালো করে শোনার চেষ্টা করল নীলার কথা। কিছুই বুঝতে পারল না।

শোয়েব আবার ডাকল, "ও নীলা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?"

"কে নীলা?" ঘড়ঘড়ে একটা স্বরে অন্য কেউ যেন কথা বলল নীলার মুখ দিয়ে।

শোয়েবের ভ্রু জোড়া কুঁচকে গেল। এই গলার স্বর কার! এটা তো নীলার স্বর নয়। ও আবার জিজ্ঞেস করল, "এই নীলা, তুমি ওভাবে কথা বলছ কেন?"

"সরে যা কুত্তার বাচ্চা। আমাকে এই মেয়েটাকে ভোগ করতে দে।" আবার সেই পুরুষালী কণ্ঠস্বর শোনা গেল নীলার মুখ থেকে। আর সাথে সাথেই বিকট শব্দ করে কেঁদে উঠল নীলা। যেন কেউ ওকে খুব আঘাত করেছে। সকালে পরা

আকাশি শাড়িটাই নীলা পরে আছে এখনও। সেই শাড়ির নিচের দিকটা রক্তে ভিজে উঠতে লাগল একটু একটু করে।

কোরানের একটা আয়াত শব্দ করে পড়তে লাগল শোয়েব। হা আল্লাহ, এটা কী হচ্ছে তার বউয়ের সঙ্গে। ওর বাবা ওকে বলত, জানিস ব্যাটা, জ্বীন সত্যিই আছে। ও বিশ্বাস করত না। এখন এই পরিবেশে মনে হচ্ছে ওর বাবা মিথ্যে কথা বলত না। রক্ত দেখে ভয় পেল শোয়েব। ও ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে লাগল ডাক্তার ডেকে আনার জন্য। এত রাতে ডাক্তারবাবু আসেন কিনা সন্দেহ। দরকার হলে ও ডাক্তারের পায়ে পড়ে যাবে।

৬

ডাক্তার মল্লিক শোয়েবকে ঘরের ভেতর ডাকলেন। এতক্ষণ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করার জন্য ওকে ঘরের বাইরে দাঁড়াতে বলেছিলেন। শোয়েব ঘরে ঢুকতেই ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ডাক্তার মল্লিক গলাটা একেবারে খাদে নামিয়ে বললেন, "এইভাবে কেউ সঙ্গম করে! তুমি কি একেবারেই কিছু জানো না। ও গভীরভাবে ব্যথা পেয়েছে। আগামী এক সপ্তাহ কোনোভাবেই তোমরা মিলিত হবে না। এতে বিপত্তি আরও বাড়বে। আরও ব্লিডিং হতে পারে। খেয়াল রেখো ব্যাপারটা। যদিও তোমার বউ বলেছে তুমি জোর করে কিছুই করোনি। বিষয়টা প্রথমবার ঘটেছে বলে তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি।"

"ও বলল এ কথা?" শোয়েব ডাক্তার মল্লিকের দিকে চেয়ে রইল প্রশ্ন করে।

সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ডাক্তার মল্লিক বললেন, "একটা ওষুধ লিখেছি আর একটা মলম, কাল সকালে দোকান খুললে নিয়ে আসবে। এখন আমি আসি।" কথা শেষ করেই তিনি হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। ফিজের কথা বললেনই না।

শোয়েব ঘরে ঢুকে দেখল নীলা বালিশে মাথা গুঁজে কাঁদছে। ও নীলার পিঠে হাত রাখল। নীলা মুখ ফেরাল না। মুখ না ফিরিয়েই ফোঁপাতে লাগল। শোয়েব ওর পিঠে হাত বোলাতে লাগল। নীলা কাঁদতে কাঁদতেই বলল, "কাল আমি কিছু বুঝিনি জানো। কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি। একটা নোংরা লোক আমাকে ছুঁচ্ছে। কাল জঙ্গলেও এই লোকটাই আমার..." আর কথা বলতে পারল

না নীলা। কান্নায় ওর গলা বুজে এল।

শোয়েবের মনে হচ্ছে যা ঘটছে তা কোনো সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। তাও ও নীলাকে জিজ্ঞেস করল, "কোন লোকটা নীলা? তাকে কেমন দেখতে?"

নীলা তাকাল শোয়েবের দিকে। সে দৃষ্টিতে যেন সকালের সেই স্নিগ্ধতা আর নেই। এ যেন মরা মানুষের চোখ। নীলা যেন কিছুকে ভয় পাচ্ছে। গলা নামিয়ে সে বলল, "একটা বীভৎস চেহারার লোক! তার শরীরে কোনো কাপড়চোপড় নেই। কোনো রোগে যেন তার শরীর থেকে মাংস গলে গলে পড়ছে। তার গা থেকে বেরোচ্ছে বাসি, পচা মরার দুর্গন্ধ। আমাকে সে জোর করে আদর করতে চাইছে। আমার শরীরের ওপর জোর করে..."

নীলার ঠোঁটে হাত রাখল শোয়েব, "আর কিছু বলতে হবে না তোমাকে। আমি বুঝেছি নীলা, সব বুঝেছি, নিজের আব্রু, নিজের লজ্জার কারণে তুমি মল্লিক ডাক্তারকে আমাদের মিলনের কথাটা বলেছ! আচ্ছা নীলা বলো তো, সেই লোকটা কি এখনও এই ঘরেই আছে?"

নীলা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। শোয়েব কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে আর নীলা ছাড়া এই ঘরে আর কেউ নেই। সে আবার প্রশ্ন করল, "লোকটা কোথায় নীলা?"

নীলা ঘরের দক্ষিণ দিকে আঙুল তুলে দেখাল। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল শোয়েবের। সেদিকে কেউ নেই, শুধু দেয়াল বেয়ে একটা বিশাল আকারের কালো মিশমিশে টিকটিকি অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। এই কালো টিকটিকিগুলোকে মোটেই সহ্য করতে পারত না ওর বাবা। করিম বলত ওরা ভালো না রে একদম ভালো না, ওদের আনাগোনা অজরাইলের আগমন নির্দেশ করে।

নীলা অনেক কষ্টে ঘুমাল। শোয়েবের কিছুতেই যেন ঘুম আসতে চাইল না। মায়ের শরীরটা থেকে থেকে ওর চোখের সামনে ভাসতে লাগল। ওভাবে কেউ কাউকে মারতে পারে, কোনো মানুষ ওভাবে মানুষকে খুন করে! মায়ের ওই বীভৎস চেহারাটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই নীলার ওই পুরুষালী গলার স্বর যেন কানের পর্দায় এসে আবার আঘাত করল। সেই রক্তে ভিজে যাওয়া শাড়িটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

"মৌমাছির চাকে কখনো ঢিল মারতে নেই বুঝলি রে বাপ! এইসব জ্বীন

পিশাচের জগৎ হল সেই মৌচাক। কেউ সেই চাক ভেঙে দিয়েছে। যে পিশাচেরা কামনার পাঁক বুকে নিয়ে বেড়ায় তাদের সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে মেয়েমানুষের শরীরের নজরানা বা ভেট। তারই লোভে এসেছে একটা পিশাচ।"

ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে বাবাকে দেখতে পেল শোয়েব। ওরা বাবা একটা পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো ওকে বলছে। শোয়েব ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথায় বাবা?"

সুন্দর করে হাসল করিম। বলল, "আমি এখন এই পুকুর পাড়েই আছি, ফেরত কাটান করছি। যে এই পিশাচকে আমাদের পরিবারটাকে বরবাদ করে দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছে, মন্ত্রের জোরে তারই পরিবারে আমি একে পাঠাব। করিমের সাথে খেলা বের করে দেব।"

হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল শোয়েবের। ঘরের দেওয়ালে খচখচ্ করে একটা গা শিরশির করা শব্দ হচ্ছে। চোখ খুলতেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল ওর। শোয়েব দেখল আবার হাত-পা বেঁকে গেছে নীলার। ও সেই বেঁকে যাওয়া হাতে দেওয়ালে আঁচড় কাটছে। শক্ত দেওয়ালে ঘষা লেগে আঙুলের সব নখ উঠে গেছে নীলার। সেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, অথচ মেয়েটার মধ্যে কোনো ভাবান্তর নেই।

শোয়েব লাফিয়ে নামল চৌকি থেকে তারপর দৌড়ে গিয়ে নীলাকে সরিয়ে নিল দেওয়ালের কাছ থেকে। ওকে চৌকিতে নিয়ে এসে বসাল। নীলা ঘোলাটে চোখে চেয়ে আছে শোয়েবের দিকে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছে। সেই দৃষ্টি যেন বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না। শোয়েব একটা শুকনো কাপড় চেপে ধরে আঙুল থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল।

"কী হয়েছে নীলা, খুব ব্যথা করছে?"

নীলা উত্তর দিল না শোয়েবের প্রশ্নের। হঠাৎ ঘর কাঁপিয়ে পুরুষালী পৈশাচিক গলায় হেসে উঠল। সেই বিকট হাসির শব্দে কান ফেটে যেতে চাইল শোয়েবের। সেই আয়াতটা আবার পড়তে লাগল ও মনে মনে। বাবাকে যদি একবার খুঁজে পাওয়া যেত, তাহলে জানা যেত আদৌ কোনো পিশাচের নজর পড়েছে কিনা ওর বউয়ের ওপর।

৭

শোয়েব ওর বাবার খোঁজে বেরিয়েছিল। লোকটা কোথায় যেন ভোজবাজির মতো উবে গেছে! আজ মর্গ থেকে মৃতদেহ দিয়ে দেবে। কবর দিতে নিয়ে যেতে হবে মা-কে। শেষ যাত্রায় বাবা থাকবে না এটা ভালো দেখায় না। লোকটা যতই খারাপ হোক, সে ওর বাবা। ওর মায়ের স্বামী। শেষ যাত্রায় লোকটার থাকা খুব জরুরি।

বাড়ির সামনে আসার সাথে সাথেই ঝড়ের গতিতে এসে একটা লোক শোয়েবের গলা টিপে ধরল। রাস্তা দিয়ে যারা হেঁটে যাচ্ছিল কেউ শোয়েবকে বাঁচাতে এগিয়ে এল না। বরং যে যার মতো এদিক ওদিক চলে গেল।

"আমাকে ছেড়ে দিন... আপনি কে? কী চাই আপনার? কেউ আমাকে বাঁচাও..." ছটফট করতে করতে শোয়েব প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগল।

লোকটা হিসহিসে গলায় বলল, "কেউ তোকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে না। আমাকে আটকায় সেই সাহস এই তল্লাটে কারও নেই। আমি রহিম কসাই! বল আমার নীলা বেটির সঙ্গে কী করেছিস। তুই আর তোর বাপ মিলে ওর সাথে কী জাদুটোনা করেছিস, বল? ও ওভাবে শুয়ে আছে কেন?"

"আমাকে বিশ্বাস করুন আমি কিছু করিনি। আমি ওকে ভালোবাসি। ওকে শাদি করেছি। আমার বাবার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই অনেকদিন হয়ে গেছে। আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।" শোয়েব বৃথা চেষ্টা করতে লাগল।

পাশ থেকে একটা ক্ষীণ রোগগ্রস্ত গলার স্বর শোনা গেল, "ওকে ছেড়ে দাও মামা। ও কিছু করেনি। অন্য একটা লোক..." আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না নীলা, মাটিতে পড়ে গেল ধপ্ করে। শোয়েব ওকে তুলে নিয়ে চৌকিতে শুইয়ে দিল। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে মেয়েটা। ওর যেন শ্বাস টানতেও কষ্ট হচ্ছে।

"কী হয়েছে ওর?" প্রশ্ন করল রহিম।

শোয়েব দেখল দানবের মতো চেহারার লোকটাকে হঠাৎ বাচ্চা ছেলেদের মতো অসহায় দেখাচ্ছে। নীলার প্রত্যেকটা যন্ত্রণাকাতর নিঃশ্বাস যেন লোকটার মনে হাতুড়ির মতো বাড়ি মারছে।

"আমি জানি, নীলা আপনাকে রহিম মামা বলে ডাকে। আমার মন বলছে রহিম মামা, নীলাকে কোনো জ্বীন পিশাচ ধরেছে। ডাক্তার বলছে মৃগীরোগ।

আমার তা মনে হয় না। জানি না কীভাবে ওকে সুস্থ করব! ওদিকে আমার মা-কেও কেউ মেরে রেখে চলে গেছে। আজ দু'দিন পরে মায়ের মৃতদেহ পাব। বাবাও যেন কোথাও ফেরার হয়ে গেছে। আমার বাবারই পাপের শাস্তি ভোগ করেছে আমার মা। বা হয়তো আমিও তারই পাপের ফল ভোগ করছি। এইসব জ্বীন পিশাচ নিয়ে আমার বাবা নোংরা কারবার করত, তাই হয়তো আজ এই দুর্দশা আমাদের!" শোয়েব মাথা নিচু করে ফেলল কথা বলতে বলতে। ওর গলা ধরে আসছে। কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। খুঁজে পাচ্ছে না কোনো পথ।

"আমি একজনকে চিনি। আমি তার কাছে যাব। আমার বেটির একখণ্ড কাপড় দাও তো আমায়।" রহিম হাতটা এগিয়ে দিল শোয়েবের দিকে।

যে শাড়িটা নীলা পরেছিল সেটা থেকেই কিছুটা ছিঁড়ে রহিমের হাতে দিল শোয়েব। রহিম সেটা নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। শোয়েব ওর পেছনে পেছনে দৌড়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু লোকটা যেন হাওয়ার চেয়েও দ্রুত চলাফেরা করে।

৮

কবরে বা চিতার কাঠে শোয়ালে মানুষকে আর ততটা কদর্য দেখায় না, ঠিক মৃত্যুর পরে যতটা দেখায়। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল শোয়েব। আর কখনো মা-কে দেখতে পাবে না ও। বুকের মধ্যে একটা পাখি কেমন যেন ছটফটিয়ে উঠল। এই পাখিটার নাম দুঃখ। ভীষণ যন্ত্রণা দেয় এটা মানুষকে। মৌলভি সাহেব কলমা পড়া শুরু করেছেন। লাশ স্নান করানো অনেক আগেই হয়ে গেছে। এবার মাটিতে চিরতরে মিলিয়ে যাবে মা। শোয়েবের কানে কানে একজন এসে বলল, "সে এসেছে। এখানে পুলিশ আছে তাই সে আসতে চায় না। তোমার সাথে দেখা করতে চায়। শেষ দেখাটা দূর থেকেই দেখতে চায় সে।"

মায়ের শেষ যাত্রায় অন্য কারও কথাই শুনতে ইচ্ছে করল না শোয়েবের। সব কিছু শেষ হতে হতে অনেকটা সময় লেগে গেল। গোরস্থান থেকে বাড়ির পথ ধরল শোয়েব। কিছুটা হাঁটার পরেই মনে হল গাছতলায় দাঁড়িয়ে কেউ একটা ডাকছে ওর নাম ধরে। সেদিকে চাইল ও। কালো চাদর মুড়ি দিয়ে কেউ একজন

দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

শোয়েব জিজ্ঞেস করল, "আমাকে ডাকছেন?"

"হ্যাঁ বাপ তোকেই ডাকছি।"

নিজের বাবার গলাটা চিনতে অসুবিধা হল না শোয়েবের। ভীষণ বিরক্ত হল ও। প্রথমেই বলল, "তোমার পাপেই আমাদের আজ এই অবস্থা। মা-কে কে মেরেছে ওভাবে আব্বা?"

"আমি কখনোই ভালো স্বামী হতে পারিনি। হতে পারিনি ভালো বাবাও। কিন্তু আমি তোর মায়ের হত্যা করব এটা তুই বিশ্বাস করিস?"

শোয়েব তাকিয়ে দেখল তার বাবার গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। লোকটা খারাপ হতে পারে, অসৎ বা মিথ্যাবাদী হতে পারে, কিন্তু এই চোখের জল যেন বলছে লোকটা হত্যাকারী নয় আর যাই হোক।

"শোন বাপ, আমি আমার জীবনে অনেক পাপ করেছি। অনেক মায়ের কোল শূন্য করেছি। অনেকের স্বামীকে খেয়েছি, অনেকের স্ত্রীয়ের সতীত্ব নষ্ট করেছি জাদুটোনার আড়ালে। তাই হয়তো আজ এই দিন আমাকে দেখতে হচ্ছে। সেদিন ওই শক্তির সঙ্গে আমি পেরে উঠিনি। আমার সামনেই ও তোর মা-কে মেরেছিল। আমার এতদিনের বিদ্যা কাজ করেনি সেদিন। জানতাম যে মানুষ খোদার আশ্রয় ছেড়ে পাপের আশ্রয় নেয় তার এই পরিণতিই হয়। আমারও হল। কিন্তু তোর যাতে কিছু না হয় সেই ব্যবস্থা আমি করেছি। আমি ফেরত কাটান করেছি। যে শক্তি তোর মা-কে খেয়েছে সে হয়তো তোকে বা আমাকেও খেত, সেই পথ বন্ধ করে দিয়েছি। যে তাকে পাঠিয়েছিল আমি সেই শক্তিকে তার কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছি। কাছিম পুকুরের পাশে বসে দু'দিন টানা ক্রিয়া করে আমি ফল পেয়েছি। এবার ওরা মরবে সব। আমার স্ত্রীকে যেমন মেরেছে, যে পাঠিয়েছে তার যদি স্ত্রী থেকে থাকে প্রথমে মরবে সে।"

শোয়েবের এবার করুণা হল বাবাকে দেখে। লোকটা সেই আর একটা ভুল করে বসল। ও বলল, "আব্বা, তুমি কি কখনোই সৎ পথে থাকতে পারলে না। যে অপরাধ করেছে তাকে শাস্তি না দিয়ে তার স্ত্রীয়ের ক্ষতি করতে চাইলে!"

"প্রতিহিংসের আগুন বড় খারাপ রে বাছা। ওই আগুনে পুড়তে পুড়তে আবার এই পাপ আমাকে করতেই হল। যাক আর পাপ করব না। আমি তোর

মায়ের খুনের শাস্তি মাথা পেতে নেব। আমি ধরা দেব। বলব আমিই তাকে খুন করেছি। যতই হোক আমারই পাপের আগুনে সে জ্বলে পুড়ে মরেছে। তোরা সাবধানে থাকিস।”

শোয়েব দেখল দৌড়ে ওর বাবা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ও ডাকল, “আব্বা!” কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

ঘরে ফিরে এসে দেখল আরও করুণ অবস্থা হয়েছে নীলার। সে যেন চৌকির সঙ্গে মিশে গেছে। গোঁ... গোঁ... করে একটা বিশ্রী শব্দ বেরোচ্ছে তার গলা দিয়ে। নীলার চৌকির পাশে বসে আছে সেই লোকটা। যে নিজেকে রহিম কসাই বলতে ভালবাসে। সে নীলার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর মাঝেমাঝেই চোখের কোনা মুছছে গামছা দিয়ে।

“রহিম মামা চলুন ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।” শোয়েব বলল।

রহিম কেমন যেন ভাসা ভাসা চোখে চাইল শোয়েবের দিকে। চোখের তারা যেন পাথর হয়ে গেছে লোকটার। সে বলল, “লাভ হবে না গো জামাই, কোনো লাভ হবে না।”

সাথে সাথে নীলা পুরুষালী গলায় রহিমকে ভেঙিয়ে বলল, “লাভ হবে না গো জামাই, কোনো লাভ হবে না।” তারপরেই হো... হো... করে ভয়ংকর পৈশাচিক হাসি হেসে উঠল।

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে রহিম চাইল নীলার দিকে। তার পরেই কেঁদে ফেলল, “মা-রে, মা আমার... তোর এই অবস্থা যেই করে থাকুক আমি তাকে জিন্দা কবর দেব। তোর কাপড় হাতে নিয়ে নবীন ওঝা বলেছে তোর ওপর পিশাচের ভর পড়েছে। এই পিশাচকে আমি মুক্ত করবই। আর নবীন এও বলেছে এই পিশাচকে কোনো উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছে।”

শোয়েবের হাতটা ধরে টানল রহিম। বাইরে নিয়ে এল ওকে। তারপর ফিসফিস করে বলল, “আজ সন্ধ্যেবেলা নীলার মা-ও মারা গেছে। তাকেও কেউ মেরে রেখে গেছে। ঠিক যেমন তোমার মা-কে মারা হয়েছিল সেইভাবেই।”

“আমাকে একবার সেই নবীন ওঝার কাছে নিয়ে যেতে পারবেন। হয়তো সে অনেক কথা আপনাকে বলেনি। আমি জানতে চাই কোন পিশাচের আছর

আমার বউয়ের গায়ে লেগেছে। আর তাকে বাঁচানোর উপায়ই বা কী!" বলল শোয়েব।

রহিম কী যেন একটা ভাবল। তারপরেই বলল, "এখনই চলো তাহলে।"

৯

মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে। মনে হচ্ছে একটা বন্যায় সব ভাসিয়েই প্রকৃতি শান্ত হবে। ছাতা দিয়ে মাথা বাঁচানো যায় না এই বৃষ্টিতে। রহিম আর শোয়েবের কাছে ছাতা থাকলেও যে কতটা মাথা বাঁচাতে পারত সেই নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ছাতা নেই কাজেই ভিজতে ভিজতেই এগিয়ে চলেছে ওরা দু'জন। পথের পাশে কোলাব্যাঙেদের মোচ্ছব লেগে গেছে।

পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে রহিম। এ পথ শোয়েবের চেনা নয়। তাকে রহিম যেভাবে পরিচালনা করছে সে সেভাবেই হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কাদায় পা ডেবে যাচ্ছে। পিছলে হড়কে যাচ্ছে ওরা। তাও ওদের আজ যেন থামা নেই।

এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রহিম। সে হাত তুলে অন্ধকার একটা মাঠ দেখাল। তারপর ফিসফিস করে বলল, "ওই যে ওইদিকে ওইখানেই থাকে নবীন। আগে এই জায়গাটা হিন্দুদের শ্মশান ছিল। সেও প্রায় বছর তিরিশ আগের কথা। তখন তোমার জন্মই হয়নি। তিরিশ বছর কি তারও অনেক আগে থেকে নবীন এখানে বসবাস করে। তখন আমাদের বড়মিয়া, মানে তোমার বউয়ের দাদাজানের খুব প্রভাব ছিল। তিনিই নবীনকে এখানে একটা ঘর করে দিয়েছিলেন। নবীন ওর উপকার করেছিল খুব। মাছের ভাগ নিয়ে এক মহাজনের সঙ্গে ঝগড়া লাগে মীর শোহরাবের। প্রতিপক্ষের ক্ষমতা ও শক্তি দুইই বেশি ছিল। গুন্ডা-পান্ডা নিয়ে তার সঙ্গে মোকাবিলা করা মানে ছিল স্বয়ং মৃত্যুকে নেওতা দেওয়া। মীর সাহেব তখনই নবীনের কাছে আসেন। উনি বলেন দেখি তোমার শ্মশান বিদ্যা কেমন শক্তিশালী! আমার এক শত্রুকে কোনো মানুষ আক্রমণ করবে না আমার দলের কিন্তু লোকটা যেন কাল সকালের সূর্য দেখতে না পায়। তোমরা কীসব মারণ ক্রিয়া করো বলে শুনেছি। দেখি তার দম আছে কিনা! সেই কথা শুনে শুধু হেসেছিল। পরের দিন সকালে সুরমা বাইজির কোঠাবাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় সেই মহাজনকে।

সুরমা বলেছিল, "বাবু সেই যে ঘুমোল আর ওঠেনি।"

শোয়েব ভেবেছিল এই নবীন ওঝার সঙ্গে দেখা হলেই দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেবে। কৈফিয়ৎ চাইবে, কেন সে ওর সংসারে এমন অভিশাপ নামিয়ে আনল। কিন্তু জায়গাটায় পা রেখে আর রহিমের কথাগুলো শুনে একটু যেন দমেই গেল ও।

শ্মশানের মাটিতে পা রেখেই কেমন যেন গা ছমছম করে উঠল শোয়েবের। এটা মনের ভুলও হতে পারে, কিন্তু কেন যেন ওর বারবার মনে হতে লাগল কারা যেন চাপা গলায় কথা বলছে। সেই মুহূর্তেই একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল অন্ধকারের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খানখান করে দিয়ে– গুম... গুম... গুম... গুম... করে। প্রাণের ভেতরটা ধুকপুক করে উঠল শোয়েবের। তবুও সে থামল না। এগিয়ে গেল। রহিমের অবশ্য সাহসের অভাব নেই। সেই নির্ভয়েই এগিয়ে যাচ্ছে।

রহিম একটা ইঁটের ঘরে সামনে এসে ডাক দিল, "নবীন বাবা, ও নবীন বাবা!"

ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল অশ্রাব্য গালিগালাজ। শোয়েবের মনে হল কোনো বৃদ্ধ মানুষ কথা বলছেন। শ্লেষ্মা জড়ানো তাঁর গলার স্বর। তিনি বলছে, "সারাদিন এরা জ্বালিয়ে খেলে গা। মর, মর ওলাউঠোর পুতেরা। মরার পরে কবর, আগুনও নসিব হবে না একটারও।"

রহিম এবার একটু গলা চড়িয়েই বলল, "আমি রহিম বাবা। যে মেয়েটা বিপদে পড়েছিল বলে বিকেলে এসেছিলাম সন্ধেবেলা তার মা ওর বরের মায়ের মতোই খুন হয়েছে। ওই মেয়েটার মায়ের মাথাটাও কেউ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে!"

বুড়ো নবীন বৃষ্টির মধ্যেও ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। ওর ঘোলাটে সাদা চোখটা দেখে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল শোয়েবের। এ কেমন চোখ! বিস্মিত হল ও।

নবীনকে সন্দিগ্ধ দেখাল। সে একেবারে মিহি গলায় বলল, "বলিস কী রে! আমি তো কিছুই চোখে দেখি না। তবে কয়েকদিন আগে একজন আমার কাছে এসেছিল। সে নিজের মেয়েরই ক্ষতি চেয়েছিল। নিজের ইজ্জত বাঁচাতে পিশাচের হাতে নিজের মেয়েকেও উৎসর্গ করতে তার প্রাণ কাঁপেনি। আমায় তো

জানিসই, কাউকেই ফেরাই না। অনেক চেষ্টা করে এই মড়া শ্মশানটাকেও জাগিয়ে রেখেছি।"

"আপনি মানুষ না পিশাচ!" হঠাৎ যেন সাহস ফিরে এসেছে শোয়েবের বুকে। সে চিৎকার করে নবীনকে জিজ্ঞেস করল কথাটা।

হাসল নবীন। বলল, "এখন আর মানুষ, পিশাচ আর ভগবানে কোনো অন্তর নেই। ভেবেই বল না ভগবানও তো ভক্তের ডাকে সাড়া দেয়। আর আমি দিলেই ক্ষতি!"

"হ্যাঁ ক্ষতি! আপনি যে কত বড় ভুল করেছেন সে আপনি নিজেও জানেন না। কেউ এসে আপনার পায়ে পড়ে নিজের মেয়ের ক্ষতি চাইল আর আপনি পিশাচ চালিয়ে দিলেন! এটা যে কত বড় অন্যায় সেটা আপনার মনে হল না?"

শোয়েবের কথা শুনে খুব আস্তে মাথা দোলাল নবীন। ওর মুখে হাসির একটা রেখা যেন মিলিয়ে গিয়েও মেলাচ্ছে না। বড় একটা শ্বাস ছেড়ে নবীন বলল, "বাপ মা সারা জীবন সন্তানদের মানুষ করার জন্য প্রাণপাত করে ফেলে অথচ একটা সময়ে সন্তান তাদের অপমান করার কোনো খামতি রাখে না। ওই লোকটার ক্ষেত্রেও এই ঘটনাই ঘটেছিল তাই আমি পিশাচ দিয়ে সেই মেয়েকে জব্দ করতে চেয়েছি। আজকাল অনেক বয়েস হয়েছে। এই শ্মশানে যে আসলে কোন পিশাচ আছে তাই বুঝি না। একজনের আভাস পাই। সে বড় কাম লালসা নিয়ে মরেছে। অথবা ঠিক ঠাহর করতে পারি না সে আদৌ কোনো পিশাচ না অপদেবতা!"

শোয়েব বুঝতে পারল এই লোকের এখনও অনেক শক্তি আছে কিন্তু বার্ধক্যের কারণে হয়তো কোনো ভুল হয়েছে। ও নীলার সাথে ঘটে যাওয়া প্রতিটা ঘটনা নবীনকে বলল। নবীন শুনতে শুনতে একটা সময় হাত তুলে বলল, "তোর মুখ থেকে যে ঘটনা শুনলাম, আমার মন বলছে এ কোনো এক যক্ষ। যার চরম লোভ লালসা। নারী শরীরের প্রতি এদের টান অমোঘ। অবিলম্বেই একে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই শ্মশানেই সে ছিল। আমি চোখে দেখি না তাই তাকে চিনতে পারিনি। শুধু তার উপস্থিতি বুঝতাম। সেই-ই আমার আবাহনে সাড়া দেবে বুঝতে পারিনি। এখন একটাই পথ খোলা। বিদ্যেধরীর কাছে যা। তারই জঙ্গলে যখন পিশাচে তোর বউকে ধরেছে সেই উপায় করে দেবে। বিদ্যেধরীর কোনো জাত নেই

রে বাপ। সে তান্ত্রিক দেবী সে সবার মা। তুই তার প্রসাদী ফুল নিবি। আর নিবি গুয়ে বাবলার মূল, সাথে নিবি শ্বেত চন্দনের মূল। এই তিন জিনিস তোর বউয়ের কপালে ঠেকালেই সে নতুন জীবন ফিরে পাবে। তবে জানবি সময় বেশি নেই। সে যাকে ধরে তাকে তিন দিনেই শেষ করে দেয়। আজই শেষ রাত।"

শ্মশান থেকে বেরিয়ে ছুটতে লাগল শোয়েব আর রহিম। দৌড়তে দৌড়তেই রহিম বলল, "শোনো জামাই বিদ্যেধরীর মন্দিরের নাট মন্দিরের পাশেই শ্বেতবেরেলা পাবে, তার শিকড় তুমি উঠিয়ে নিও আর আমি চললাম চণ্ডাল পাড়ায়। সেখানে দিঘির পাশে আছে দুটো সাদা চন্দনের গাছ। একটার শিকড় আমি তুলে আনব।"

আঁতকে উঠল শোয়েব। বলল, "কিন্তু সেই গাছে যে সাপ আছে! কেউ যায় না ওদিকে।"

রহিম দৌড়োতে দৌড়োতে হাঁফিয়ে গেছিল। হাঁফাতে হাঁফাতেই বলল, "মেয়ের জন্য বাপ জান দিতে পারে। মেহেরাব ওর বাপ হতে পারে, কিন্তু ওকে কোলেপিঠে আমিই মানুষ করেছি।"

শোহরাব একটা সত্য এতক্ষণে জেনে গেছে। কিন্ত সেটা প্রকাশ করল না রহিমের সামনে। তার বাবা ফেরত কাটান করার পরেই ওর মায়ের মতোই খুন হয়েছে নীলার মা। বাবা বলেছিল যে এই কাজ করেছে একইভাবে তার স্ত্রী মরবে। নীলার মা মারা গেছে। সত্যিই বিচিত্র এই দুনিয়া। বাবা নিজের অপমানের শোধ নিতে মেয়ের জীবনও বাজি রেখে দেয়!

ওরা দু'জন দু'দিকে চলে গেল। বিদ্যেধরীর মন্দির পৌঁছেই শোয়েব খুঁজতে লাগল শ্বেতবেরেলার গাছ। কিন্তু ও সেই গাছটা চেনে না। অগত্যা মৃত্যুঞ্জয় পুরোহিতের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। হাত জোড় করে বলল, "বাবা! আমি আপনার ধর্মের নই, আমাদের ঈশ্বরকে ডাকার পথও আলাদা। নবীন ওঝা বললেন মা বিদ্যেধরীর কোনো জাতপাত নেই। বাবা, আমার বউয়ের খুব বিপদ। মায়ের প্রসাদী ফুল আর শ্বেতবেরেলার শিকড় পেলে ওকে সারিয়ে তুলতে পারব।"

মৃত্যুঞ্জয় শোয়েবকে একটা ফুল দিয়ে বললেন, "এটা নাও। মায়ের জবাফুল আর ওই যে দক্ষিণ দিকের ওই গাছটা দেখছ ওটাই বেরেলা গাছ। ওর মূল নিলে ওটা মরে যাবে, কিন্তু মায়ের এটাই ইচ্ছে হয়তো। মা হয়তো কাউকেই মরতে

দেবেন না।” তারপর জয় মা জয় মা বলতে বলতে মৃত্যুঞ্জয় পুরোহিত মন্দিরের দিকে চলে গেলেন।

শোয়েব আর সময় নষ্ট করল না। সে একটা লোহার পাত দিয়ে মাটি কুপিয়ে বের করে ফেলল গাছের শিকড়। সেই শিকড়ের কিছু অংশ কেটে নিয়ে ছুটল বাড়ির দিকে।

১০

শোয়েব ঘরে ঢুকে দেখল বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে নীলার। তার সারা শরীর কেমন যেন নীলবর্ণ ধারণ করেছে। যেন কেউ বিষ ঢেলে দিয়েছে তার মধ্যে। শোয়েব অপেক্ষা করতে লাগল রহিমের জন্য। শ্বেত চন্দন না এলে কোনো কাজই হবে না। ঘড়ির কাঁটা বলছে রাত এগারোটা চল্লিশ। আর মাত্র কুড়ি মিনিট বাকি আছে। শোয়েব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এখন নীলা মুখ থেকে শ্বাস টানছে, বোঝা যাচ্ছে ওর কষ্ট হচ্ছে। একবার ডাক্তার ডাকলে হয়। শোয়েব উঠে দাঁড়াল। ঠিক তখনই ঘরে এসে ঢুকল রহিম।

শোয়েব দেখল রহিমের সারা শরীর ভিজে, চোখগুলো কেমন যেন বুজে আসতে চাইছে। ও বলল, “রহিম মামা, কী হয়েছে?”

রহিম শোয়েবের হাতে শ্বেত চন্দনের মূলটা তুলে দিয়ে বলল, “এটা বেটির মাথায় ছোঁয়াও। সময় নেই হাতে।”

শোয়েব দ্রুত তিনটে জিনিস একসাথে নিয়ে নীলার মাথায় ছোঁয়াল। অস্বাভাবিক কাঁপতে লাগল নীলা। চৌকির পাটাতনের সাথে মাটির সংঘর্ষ হয়ে কান ফাটানো শব্দ হতে লাগল। ওর গলা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল ভয় ধরানো নানা চিৎকার। কেউ যেন প্রবল ক্রোধে চেঁচাচ্ছে ওর শরীরের ভেতর থেকে। কারও গায়ে যেন গরম তেল ফেলে দেওয়া হয়েছে। অনেকক্ষণ নড়াচড়া করার পরে নীলার শরীরটা ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেল। শোয়েব বুঝতে পারল নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আবার স্বাভাবিক নিয়মে চলছে। ধীরে ধীরে চোখ খুলল নীলা। চোখ খুলেই ও বলল, “মামা!”

শোয়েব এতক্ষণ খেয়াল করেনি। এই প্রথমবার দেখল ভালো করে রহিমের



দিকে। রহিমের ঠোঁটের কষ বেয়ে ফেনা বেরিয়ে আসছে। শরীরটা কেমন যেন নীল হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস পড়ছে খুব ধীরে ধীরে।

নীলা দৌড়ে রহিমের কাছে গেল। ওর চোখের জল বাঁধ মানল না। ও জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে মামা?"

ওই অবস্থাতেও রহিম হালকা একটা শ্বাস টানল কষ্ট করে। তারপর হাসি মুখে বলল, "মা-রে আমার সময় শেষ হয়েছে। চন্দন গাছের পাহারাদারেরা আমাকে কামড়েছে। হাতে আর সময় নেই। তুই তোর রহিম মামাকে ভুলিস না মা।"

নীলা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। শোয়েব নিজেকে কিছুটা প্রস্তুত করে নিল। কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে বলল, "আপনি একজন ফেরেস্তা মানুষ, মামা! কিন্তু নীলা যাকে আপনি মেয়ের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন, তার বাপ আসলে শয়তান। সেই চেয়েছিল যাতে তার মেয়ে মরে যায়। তার ওপর থেকে আমাদের বিয়ের সমস্ত কলঙ্ক মুছে যায়। সেই-ই নবীনের কাছে গেছিল এই নোংরা অভিসন্ধি নিয়ে। যার ফল আমরা সবাই ভোগ করলাম।"

রহিম বড় একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, "আক্ষেপ থেকে গেল, কুত্তাটাকে পুঁতে রেখে যেতে পারলাম না। ওর শাস্তি খোদার আদালতে লেখা আছে।" চোখ বুজে ফেলল রহিম। শোয়েব ওর বুকে হাত রেখে দেখল আর নিঃশ্বাস পড়ছে না। নীলার চোখ থেকে জল নেমে এল। মেয়েরা বোঝে, অনেক কিছুই বোঝে।

১১

নীলা মায়ের মৃত্যুর খব পেয়ে যখন বাড়ি গেল দেখল বাড়িটা শ্মশান হয়ে গেছে। দাদি আর কথা বলতে পারে না। কোনো এক সময়ে মীর মেহেরাবের একটা পা খারাপ হয়েছিল পুলিশের তাড়া খেয়ে। নীলা দেখল ওর বাবা, ওই শয়তানটার পরিণতি আরও ভয়ংকর হয়েছে। পক্ষাঘাতে তার শরীর অচল হয়ে গেছে। কয়েকজন চাকর তাকে দেখছে ঠিকই, কিন্তু নীলা জানে যেদিন মীর মেহেরাব ওদের টাকা দিতে পারবে না সেদিন আর ওকে দেখার কোনো লোক থাকবে না।

মীর মেহেরাব গোঁ...গোঁ... শব্দ করে নীলাকে কিছু একটা বলতে গেল।

নীলা সেটা না শোনার ভান করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ওর মন বলল পাপ যখন করেছ শাস্তি পেতেই হবে।

শোয়েব আর নীলার সুখের সংসার শুরু হল। বেশ মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করল শোয়েব। এবার ওকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। ও পড়াশোনা আর কাজ নিয়েই থাকে। বউকে কোনো কষ্ট পেতে দেয় না। এরই মধ্যে হঠাৎই একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেল নীলা। ডাক্তার মল্লিকের চেম্বারে ওকে নিয়ে গেল শোয়েব। তিনি দেখে বললেন, "খুশির খবর শোয়েব! তুমি বাবা হতে চলেছ।"

ওদের সংসারে যেন এখন পূর্ণিমার আলো। কোথাও যেন সে রাতের অমাবস্যার বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই। শোয়েব যেন কোনো অযত্নই করতে যায় না বউয়ের। এরই মধ্যে একদিন রহমান এসে খবর দিল, শোয়েবের বাবা জেলে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে একবার ছেলেকে দেখতে চায়।

শোয়েব আর নীলা জেলে দেখা করতে গেল করিমের সঙ্গে। জরাজীর্ণ চেহারা হয়েছে করিমের। ওয়ার্ডেন বলল অনেক রোগে ধরেছে তাকে। কিডনির অবস্থা ভালো না। আজকাল আর কারও সাথে ভালো করে কথাও বলে না লোকটা। একটা ঘরে আনা হল করিমকে। ওয়ার্ডেন বলল, "চিনতে পারছ? এই হল তোমার ছেলে আর তোমার ছেলের বউ!"

বেশ কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল করিম ছেলে আর তার বউয়ের দিকে। তারপর ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, "ও বাপ, এটা তো তোর বাচ্চা না রে। তোর বউয়ের পেটে পিশাচের বাচ্চা আছে!"

"আব্বা! কী বলছ কী!" চেঁচিয়ে উঠল শোয়েব।

ওয়ার্ডেন বলল, "আপনারা যান, ওর মাথাটা পুরোই খারাপ হয়ে গেছে। জানি না কবে কী খবর শোনেন!"

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে জেল থেকে ফিরে এল নীলা আর শোয়েব। বাবা অমন কথা কেন বলল কিছুতেই বুঝতে পারল না শোয়েব।

১১

আজ ডাক্তার মল্লিক বলেছেন কলকাতা থেকে ওঁর এক বন্ধুকে উনি ডেকে আনছেন নীলার বাচ্চার ডেলিভারির জন্য। সেই ডাক্তার নাম করা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ! কোনো সমস্যাই হবে না নীলার।

এখন নীলাকে ওটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাইরে অপেক্ষা করতে করতে ঘামে ভিজে যাচ্ছে শোয়েবের শরীর। একজন নার্স ওকে বলেছিল বেশি সময় লাগবে না খুশির খবর পেতে। কিন্তু চারঘন্টা কেটে গেছে ভেতর থেকে কেউ বেরোচ্ছেও না, কোনো খবরও আসছে না।

ঠিক সেই সময়েই ওয়েটিং রুমের দরজা ঠেকে ঢুকল রহমান। ওর মুখটা কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে খুব ধীর গলায় ও বলল, "তোর বাবা আজ সকালে জেলে মারা গেছেন। এক্ষুনি খবরটা এল।"

আনন্দের মধ্যেও একটা ধাক্কা খেল শোয়েব। রহমান বলল, "আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম কাল। আমাদের মিহির দর্জি আছে না, ও এসে বলছিল ওই যে পুরোনো শ্মশানটা আছে সেখানে যে বুড়ো ওঝাটা থাকত সেও কাল মরে পড়েছিল শ্মশানের বুড়ো বটের তলায়।"

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার মল্লিক অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে শোয়েবের কাঁধে হাত রাখলেন। আক্ষেপের সুরে বললেন, "তোমার একটা সুস্থ সবল ছেলে হয়েছে। কিন্তু মা-কে অনেক চেষ্টা করেও আমরা বাঁচাতে পারলাম না। ওর ব্লিডিং বন্ধই হচ্ছিল না। ছেলেকে চাইলে দেখে আসতে পারো।"

হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাউ হাউ করে কাঁদল শোয়েব। তারপরে দেখতে গেল ছেলেটাকে। এই ছেলেকে নিয়ে বাকি জীবনটা ভাবতে হবে এখন। কিন্তু ছেলেকে দেখেই ওর গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল। ওর যেন মনে হল বাচ্চাটার কান অস্বাভাবিক বড় আর এখনই বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে আছে বাচ্চাটা। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার হল বাচ্চাটা ব্রহ্মতালুর দু'পাশে কেমন যেন উঁচু মতো। যেন মনে হচ্ছে দুটো শিং।



মনীষ মুখোপাধ্যায় ফুটবল প্রেমী, পাহাড় পাগল, ভালোলাগা থেকে লেখালেখি শুরু। ভৌতিক, তান্ত্রিক কাহিনি লিখতে তিনি সিদ্ধহস্ত। এবারেও 'কালসর্প' বইটিতে তিনি এক অবিশ্বাস্য কাহিনি লেখার চেষ্টা করেছেন। যাঁরা এই ধরণের গল্প পছন্দ করেন তাদের জন্য এই বই অবশ্যপাঠ্য



Smell of Books
90/6A, M.G. Road, Kolkata
www.smellofbooks.in

মূল্য - ৩২৫

9 788195 881383